

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
* * * * * * * * কলিকাতা-১২ * * * * * * * *



প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৫৯

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

ব্লক—ফাইন আর্ট টেম্পল

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দু' টাকা বারো আনা

মারি-ক্লোদ-ভাইঅঁ-কুতুরিয়ে—কে

ভূমিকা

আমার দেশের ঘরে ঘরে আজ মায়েরা "হা-অন্ন" আর "আমায় একটু শান্তিতে মরতে দে" বলে কাঁদছে। আমার সেই মায়েদের হাত ধরে আমি বলতে চাই—"মরতে যাবে কেন মাগো, দেখ শান্তিতে বাঁচার দিন আমাদের দোর গোড়ায়।"

আমার এই বই লেখার প্রেরণার উৎস খুঁজে পেয়েছি একদিকে যেমন আমার নিপীড়িত দেশবাসীর কাছ থেকে অন্যদিকে তেমন আমাকে সঞ্জীবিত করেছে, দেশে দেশে, অগণিত মানুষ। সোভিয়েটে, চীনে, ফরাসী দেশে স্কান্দিনেভিয়ে পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্রগুলোয়, জার্মানীতে, মালয়ে—সর্বত্র দেখেছি মানুষের মধ্যে দুর্বার ঐতিহাসিক জাগরণ। দিকে দিকে মানুষ আজ তার সভ্যতার নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করছে আর তাদের সেই লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে একটি দিগ্‌বিজয়ী চিন্তা—"দুনিয়ায় শান্তি আনো।"

মনে আছে উস্থ-চাং গাঁয়ে তেইস বছরের মেয়ে ওয়াং চিউ-চাও-কে। সেই কাজ পাগল নতুন চীনের স্বাধীন বউটি আমার সামনে স্বাধীনতার এক ব্যাপক বাস্তব রূপ সেদিন তুলে ধরেছিল। মুক্ত মাটির ওপর, নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে বলেছিল,—"আমি যে কী সুখী।" সাইবেরিয়ার অধিবাসীদের আমাদের সংগ্রামী মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা মনে আছে। তারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। একজন বলেছিল "সোভিয়েটে, চীনে যা দেখলে, যা অনুভব করলে তা লিখে ফেল। কি বল্লে? তুমি লেখক নয়! লেখক এমনি করেই জন্মায়। তোমার দেশের মানুষের বাঁচবার লড়াইয়ের সঙ্গে

আমাদের প্রকৃতি জয়ের লড়াইয়ের কি নিকট সম্বন্ধ তা তাদের তোমাকে জানাতেই হবে।"

দেশে ফিরে এই একই ইচ্ছে প্রকাশ করেছে আমার জঙ্গী ভাইবোনেরা। যখন বজবজে আমার মজুর বন্ধুদের কাছে আমার বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার গল্প করেছি, কি দুর্নিবার আশায় তাদের চোখ জ্বলে উঠেছে। অধীর আগ্রহে চটকলের মেয়ে মন্মথ আমার হাত শক্ত করে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল—"বল, বল, সে কেমন দেশ! আমার দেশে অমন কবে হবে?" মন্মথ ৩১ বছর চটকলে কাজ করে জীবনী শক্তিকে নষ্ট করেছে। ১৯৩১ সালে বৃটিশের বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে লড়েছিল। কংগ্রেসকে প্রকৃত স্বাধীনতার দূত মনে করে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। পাঁচ বছরে তার সে আশাকে ধূলিসাৎ করেছে কংগ্রেস শাসন।

আমার সোভিয়েট ও চীন ভ্রমণের পর গোটা দু'বছর কেটে গিয়েছে। আমার এ বই অনেক আগেই বের হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেশে পৌছনর সঙ্গে সঙ্গে বিমান ঘাঁটি থেকেই সরকারী কর্তৃপক্ষ আমার সমস্ত কাগজপত্র আটক করে রেখে দেয়, বহু ঘোরাঘুরির পর কাগজপত্র উদ্ধার হলে, তবেই এই বই লেখা শুরু করা হয়েছে। এ বই-এর সমস্ত মালমশলা চীনে, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

আমার চলে আসার পর সোভিয়েট ও চীন, এই দুই দেশই আরও অনেক এগিয়ে গিয়েছে। সোভিয়েটে অবশ্য আমি মাত্র দু'দণ্ড ছিলাম। তাতেই ওদেশের মানুষের যা পরিচয় পেয়েছি, আমার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা কূল ছাপিয়ে উঠেছে। মনে আছে আমার দেশে ফেরার কথায় ফ্যাসী-বিরোধী সোভিয়েট নারী সমিতির সভানেত্রী নীনা পোপোভার উৎকণ্ঠার কথা। নীনা পোপোভা কাজে যাচ্ছেন। ঘাঁটিতে অপেক্ষমান বিমান। সময় হয়ে গেছে। তবু তিনি সেই তাড়ার মধ্যে সময় করে আমাকে কাছে টেনে এনে জিজ্ঞেস করলেন, "দেশে যাচ্ছো, খাবার সংস্থান আছে? মা-বাপ আছেন?" আমি উত্তরে যখন বললাম, যে, আজ হাজার হাজার লোকের মত সংস্থান আমাকেও করে নিতে

হবে, তখন তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন, "সাবধানে থেকো। আমাদের আন্তরিক শুভকামনা আর ভালবাসা রইল তোমার সঙ্গে।" তাঁর চোখ ছল ছল করে উঠল। বিমান ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। তবু এত কাজের ফাঁকে সোভিয়েট দেশের এই মহীয়ষী নেত্রী একটি সামান্য ভারতীয় মেয়ের যাবার পথে শুভকামনা আর ভালবাসা জানাতে ভোলেন নি।

আমি যখন মস্কোয় তখন মাও-সে-তুং চীন-সোভিয়েট বন্ধুত্ব বন্ধন দৃঢ় করে বিশ্ব শান্তি এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে—স্তালিনের সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের সেই সাক্ষাৎকার সেদিন দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষের মনে আশার বন্যা বইয়েছিল। সে সাক্ষাৎকারের পর, হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিকামী মানুষের অটুট শক্তির সামনে হটে গিয়েছে। কোরিয়াকে তারা শ্মশানে পরিণত করেছে বটে কিন্তু এক পাও এগুতে পারেনি। বরং তারা শান্তিকামী মানুষের দৃপ্ত প্রতিরোধের নমুনা পেয়েছে। একদিকে যেমন আজ অজেয় কোরিয়ার মানুষের সামনে জানোয়ারের আক্রোশ আর আস্ফালনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন চেহারা দুনিয়ার লোকের সামনে খুলে যাচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে ডন-ভোল্গা কানালের সৃষ্টি মানুষের নতুন সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী জয় ঘোষণা করছে। আজ আবার স্তালিনের সঙ্গে মিলেছেন চৌ-এন-লাই। পৃথিবীতে আবার শান্তির লড়াই দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাবে।

চীনে দু'বছর আগে যা দেখেছি তা কেবল নতুন জীবনের গোড়াপত্তন। আজ চীন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আজ যা শেখানে নতুন, কাল তা পুরণ হয়ে গিয়েছে। আমি দেখে এসেছিলাম অতি আদিম যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাদের চাষ বাস করতে। হাতে যা ছিল তাকে সম্বল করে তারা দেশ গড়ার কাজে নেমেছিল। আজ চীনে চাষবাসে ট্রাক্টর লাগান হচ্ছে। যৌথ খামার গড়ে উঠছে। দু'বছরে আমরা যত দরিদ্র হয়েছি, ওরা হয়েছে সমৃদ্ধিশালী। আমাদের আকাল-পোষা দেশে আবার আকাল ঘনিয়ে এসেছে। ওরা নিজের দেশ থেকে

আকাল তাড়িয়ে আমাদের জন্যে হাজার হাজার মণ চাল পাঠিয়েছে। ওদের নতুন সমাজ ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ দিক আমাদের জীবনে এক দুর্বার আশার সৃষ্টি করেছে।

যেদিন ওদের এক জাহাজ চাল আমাদের দেশে পৌঁছল, সেদিন আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছিল অগনিত চীন চাষী মেয়ে পুরুষের হাসি ভরা মুখ। আজ ফোং থাই, জেলার চাষী নেতা সু চাং-ওয়ান কোথায়? কোরিয়ার জঙ্গলে হয়তো বা সে প্রাণ হাতে ক'রে লড়ছে। তার চওড়া চক্‌চকে সুন্দর কপালে হয়তো একটা নতুন ক্ষতের দাগ হয়েছে। আর মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার দিচ্ছে সেই ক্ষত। হয়তো বা ওয়াং আজ তিব্বতের পাহাড়ে পাহাড়ে নতুন জীবনের রঙ্ ধরাচ্ছে। তার আঁচ লাগছে বৃদ্ধ হিমালয়ের গায়। মনে হচ্ছে এরা আমার নেহাৎ আপনজন। আর মনে হচ্ছে—দুনিয়ার এত সাচ্চা মানুষ যখন এভাবে জেগেছে, তখন শান্তি এল বলে।

চীনে মহাবিপ্লব সে দেশে যে অভূতপূর্ব জীবন এনে দিয়েছে, তার ক্ষীণতম ছবিও যদি আমি এ বইয়ে এঁকে থাকতে পারি তবে সার্থক আমার চেষ্টা। আমার এ বই পড়ে চীন সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হওয়া সম্ভব নয়। এ বই শুধু নতুনজীবনের স্পন্দনের সঙ্গে পাঠকের প্রাণের স্পন্দন মেলাবার রাস্তা খুলে দিতে চায়।

আমার এ বই উৎসর্গ করেছি ফরাসী দেশের শান্তির দূত মারি-ক্লোদ ভাইআঁ-কুতুরিয়ে-কে। দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে হাতে ধরে আমার পরিচয় করিয়েছেন মারি-ক্লোদ। তিনি সাম্রাজ্যবাদী দেশের মেয়ে। কিন্তু অসীম মানবতার জোরে, হাজার হাজার সাচ্চা ফরাসী মানুষের মত তিনি আজ বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের পুরোভাগে। গত যুদ্ধে চার বছর হিটলারের "কন্‌সেন্‌ট্রেশান ক্যাম্প"-এ বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি বন্দীদের প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। যুদ্ধের শেষে নুরেমবার্গ-বিচারে ফরাসী দেশের পক্ষ থেকে মারি-ক্লোদের ফ্যাসীবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এক অপূর্ব জবানবন্দী বিশ্বের মানুষকে মুগ্ধ করেছিল।

দেশে ফেরার সময় মারি-ক্লোদ বলেছিলেন, "মনে রেখো সমস্ত জীবনী শক্তি দিয়ে আমাদের বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করতে হবে। যুদ্ধ বাধতে দিলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।" তাঁর নীল চোখ কঠিন প্রতিজ্ঞার মত আমাদের দিকে চেয়েছিল।

বার্লিনের মাটি ছেড়ে আসছি। উড়োজাহাজের জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মারি-ক্লোদের সোনালী চুল হাওয়ায় দুলছে। কি অসম্ভব বৈদেশিক চেহারা এই মেয়েটির! কিন্তু কত আপনার।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৫২, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মাটি. মাটি…লৃভোভ.

৫ই নভেম্বর, ১৯৪৯। দশ হাজার ফুট ওপর থেকে আদিগন্ত পৃথিবীকে দেখছি। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখছি। জানলার কাঁচে মুখ লাগিয়ে দেখছি। নীচে চষা ক্ষেত, পাইনের বন আর পাগল পাগল করা নীল হ্রদ। সবুজের কত যে রকম-ফের। মাটির রঙে কত যে বাহার। মাটি চষবার কত রকমারি কায়দা। কোথাও বা লম্বা ফালি ফালি চষা ক্ষেত, কোথাও চওড়া। কোথাও জমিতে সবুজের বন্যা। কোথাও দিগম্বর হয়ে আছে গেরুয়া মাটি। আর তারই পাশে হয়তো বা একফালি ক্ষেতে কে যেন বুলিয়ে দিয়েছে কেবলমাত্র এক পোঁচ সবুজের তুলি।

নিচের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে গেলাম। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। উড়োজাহাজের জানলা আরও ঘষে পরিষ্কার করে নিলাম। আপন মনে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "দ্যাখ, দ্যাখ, নিচে কী কাণ্ড ঘটেছে।" বাঁ দিকের সিটে জানলায় নাক লাগিয়ে বসে ছিল ইরাণী বান্ধবী তুরাণ। চম্‌কে উঠে বাঁ কানে আঙুল চেপে যন্ত্রের শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বল, "কী ঘটেছে?" "দেখে যাও"—বলে হাত নেড়ে তাকে ডাকলাম। দু'জনে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে নিচের দিকে তাকালাম। "দেখছ না মাইলের পর মাইল ঢালাও চষা ক্ষেত। একটু আগেই দেখছিলাম ক্ষেতগুলো ছোট ছোট করে চষা। কিন্তু এখন যেন হঠাৎ সব বদলে গেল। এ যেন কে পৃথিবীর একূল ওকূল চষে ফেলেছে।" তারপর গলা নামিয়ে ইশারা করে বললাম, "ঐ যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তোমার ভাঙা রাশিয়ানে জিজ্ঞেস কর না—আমরা এখন কোথায়?"

আমাদের উত্তেজনা দেখে ভদ্রলোক খানিকটা আন্দাজ করেছিলেন আমরা কী জানতে চাইছি। তাঁর গম্ভীর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। বললেন, "সোবিয়েত্‌স্কম্ সাইউজা"—অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন। তুরাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে

বলে উঠল, "তাই বলুন। ওগুলো তাহলে যৌথ খামারের ক্ষেত। তাই বলি, হঠাৎ প্রকৃতির চেহারা যেন বদলে গেল।"

ভদ্রলোক দেখলাম ইংরেজি জানেন। যদিও খুব জোর রুশ টান তাতে। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চলেছ ?" বললাম, "চীন"। আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কোথাকার মেয়ে তুমি ?" উত্তর দিলাম, "ভারতবর্ষের।" প্রশান্ত ভাঁজ-খাওয়া কপাল টান করে কিছুক্ষণ তিনি চেয়ে রইলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, "এক বিরাট মহাদেশের মেয়ে তুমি এইমাত্র এক মহাদেশে ঢুকলে। আর চলেছ আর এক মহাদেশে। ভারতবর্ষ—সোভিয়েট—চীন! আশ্চর্য সৌভাগ্য তোমার। এই তিনটি দেশের মুক্তি মানে তুনিয়ার মুক্তি। সোভিয়েট আর চীন আজ মুক্ত। তুনিয়ার মানুষ তোমাদের দিকে তাকিয়ে—সূর্যের দেশ ভারতবর্ষের দিকে।" শুনতে শুনতে মনটা এক মিশ্রিত আবেগে ভরে উঠেছিল। একদিকে যেমন দেশের গর্বে মন ভরে উঠছিল, অন্য দিকে তেমন মন আন্‌চান্‌ করছিল—আজও আমরা অনেক পিছিয়ে। তুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ কত আশা নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে!

আকাশ পাতাল ভাবছি। ঠাহর করবার চেষ্টা করছি এই বিচিত্র নতুন পরিবেশ; এমন সময় বাণ-বেঁধা পাখীর মত উড়োজাহাজটা হঠাৎ যেন বিগড়ে গেল। হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোঁয়ারের মত ঘাড় বেঁকিয়ে সাঁই সাঁই করে নিচের দিকে মুখ গুঁজে ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। প্রতিবার একটা বেয়াড়া হাওয়ার কাছে আসে আর তাকে এড়িয়ে যেতে গিয়ে যেন দমবন্ধ হয় যন্ত্রের। আর ভেতরে যাত্রীদের মনে হয়—পৃথিবী কতদূরে ?"

"মাটি, মাটি—স্‌ভোভ"—পনের মিনিট ধরে হাওয়ার সঙ্গে যোঝার পর কথাটা কী যে মিষ্টি লাগল—মাটি, মাটি! পৃথিবী, পৃথিবী!—তারপর হঠাৎ মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল—"সমাজতন্ত্রের মাটি"।

দরজা খুলতেই ভেতরে আচম্‌কা দম্‌কা হাওয়া ঢুকলো। যেন হাওয়ার প্রতিটি অণুতে বরফ। নাকের ডগাটা মুহূর্তে লাল হয়ে জমে যেতে চাইল। ছাড়পত্র দেখতে যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, আমার পরণের শাড়ীর দিকে চেয়ে শঙ্কিত গলায়

বললেন, "একি! এই ঝড়ে তোমাকে এ পোষাকে নামতে দেওয়া চলে না। অন্য পোষাক নেই?" "না"—বলে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে নেমে গেলাম। নেমেই বুঝলাম কথাটার মর্ম। শীত যে কত দুরন্ত হতে পারে সোভিয়েট যাবার আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে মোটা কোটের বড় কলারে কান দুটো চেপে ধরে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসেছি। ঝড়ের ধাক্কায় বাইরে থাকা গেল না। সমস্ত জায়গাটা যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়ছে। স্বভাবতই উড়োজাহাজ ছাড়তে দেরী হল। সোভিয়েটে এই আর এক দুর্গতি। যতক্ষণ না ওরা আবহাওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হচ্ছে, ততক্ষণ ওদের উড়োজাহাজ ছাড়ার নিয়ম নেই। অনেকে এতে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে থাকেন। একবার একজন ধনী মার্কিণী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এই যে সময় নষ্ট করে তোমরা পয়সা খোয়াচ্ছ—তাতে লাভ কী? এ ভাবে ব্যবসা চলে কখনও?" শান্তস্বরে এরা উত্তর দিয়েছিল, "মানুষের জীবনের চেয়ে বেশী মূল্য আমরা আর কিছুকেই দিই না। মানুষকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে যদি সরকারের কয়েক শ' রুবল্ লোকসান যায়—যাক্ না। মানুষের জীবন নিয়ে আমরা ব্যবসা করি না।"

তন্দ্রা-জড়ানো চোখে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। গভীর অন্ধকার। কখন ল্ভোভ্ ছেড়ে এসেছি খেয়াল নেই। দূরে তারারা জ্বলছে। নিচের সঙ্গে ওপরের তফাৎ বোঝা যায় না। মন গুমরিয়ে ওঠে। মন কেমন করে পৃথিবীর জন্যে। আকাশে না উড়লে ঠিক বোঝা যায় না মাটির পৃথিবীকে এ ভাবে হারিয়ে ফেলতে কি অসম্ভব অসহায় লাগে।

উড়োজাহাজটা একপাশে হেলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে নিচের অন্ধকারকে কানা করে ঝলসে উঠল লক্ষ লক্ষ আলো। এ কোন্ রূপকথার শহর! সারি সারি সাজানো আলো—চারিদিকে কেবল চোখ-ঝলসানো আলো। হৈ হৈ পড়ে গেল। আমি একবার এদিক আর ওদিক হুটোপাটি করে দেখছি—সব দিক থেকেই অমনি দেখায় কিনা শহরটাকে। তুরাণ আর আমি দুজনে মিলে এমন হল্লা জুড়ে দিলাম যে এমন কি সেই গম্ভীর ভদ্রলোক অবধি হেসে ফেলে

ঝুঁকে দেখতে লাগলেন। "কী শহর বল তো?" হেসে জিজ্ঞেস করলেন। "কী জানি, অত আলো, মস্কো হওয়াই তো উচিত—" সন্দেহের স্বরে বললাম। "এর মধ্যে মস্কো কি—ও কিয়েভ"। "কিয়েভ, কিয়েভ—" বলে আরেক দফা হল্লা জুড়লাম আমরা। কী এক স্নেহভরা চোখে চেয়ে থেকে থেকে ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বল্লেন, "তোমাদের বয়েসে ঠিক এমনি হৈ চৈ করতে পারতাম আমি।" "আপনি সোভিয়েটের কোন্ অঞ্চলের লোক?" "কিয়েভ—" বলে ঝুঁকে আলোর রাজ্যের দিকে তাকালেন। "কিয়েভ? তাহলে আমাদের কিয়েভের কথা কিছু বলুন"—আমরা পেড়াপীড়ি শুরু করলাম। চুপ করে তিনি বসে রইলেন। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আমরা সসম্ভ্রমে চেয়ে রইলাম। পুঁচিয়ে কদম ছাঁটা চুলে একবার তিনি হাত বোলালেন। বোধ হয় আগে লম্বা চুল ছিল, এখনও চুল ঠিক করার অভ্যেস যায়নি। রগের পাশে চুলে পাক ধরেছে। কপালের বাঁ-ধারে একটা বড কাটার দাগ। অল্প বসা গাঢ় নীল রঙের চোখদুটো দামী একজোড়া নীলার মত ঝকঝক ক'রে জ্ব'লছে।

"কিয়েভ আমার মাতৃভূমি, আমার জন্মস্থান"—গল্পের শুরু হল। যন্ত্র কিয়েভের দিকে এগিয়ে চলেছে। ভদ্রলোকের সমস্ত মনটা কোথায় চলে গেছে কে জানে! আমরা অধীর আগ্রহে শুনছি।—"আমার সাতপুরুষের ভিটে কিয়েভ। আমরা পুরুষানুক্রমে শ্রমিক। আমার বাবা ১৯১৭ সালের বিপ্লবে মুক্তিসংগ্রামে শহীদ হন। বাবা মারা যাবার সময় আমি ছোট। তবু সব পরিষ্কার মনে পড়ে। কী অদম্য সাহসের বিনিময়ে কিয়েভ স্বাধীন হল! তিলে তিলে তাকে আমরা গড়ে তুললাম। কিয়েভ হয়ে উঠলো আলোর শহর।" যন্ত্রটা কিয়েভের আলোর মাথায় পৌচেছে, এবার নামতে স্বরু করবে। কে যেন চেঁচিয়ে বলে গেল, "কিয়েভে নামব না, আমরা সোজা মস্কো যাব।" মনটা দমে গেল। ভদ্রলোকের দিকে সাগ্রহে তাকালাম। হেসে বললেন, "ফেরার পথে নেমো। এখন আমার কাছে শোনো। কিয়েভকে ভালবাসতে হলে তাকে জানা দরকার।" আবার তেমনি সুদূর স্বপ্নাচ্ছন্ন দেখাল তাঁর মুখখানা।

"একদিন আমাদের সেই প্রাণপ্রিয় শহরের ওপর এল জার্মান বোমারু। সব

আলো কানা হয়ে গেল। পৈশাচিক অত্যাচার শুরু হল শান্তিকামী কিয়েভবাসীদের ওপর। সীমান্তের অপেক্ষাকৃত কাছে হওয়ায় কিয়েভকে জার্মানরা গায়ের জোরে দখল করতে সমর্থ হল। অবশ্য তার আগে শহরকে শ্মশানে পরিণত করতে হল তাদের। হাজারে হাজারে শিশুর উলঙ্গ মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে রইল চারিদিকে। সে কী বীভৎস্য দৃশ্য! মেয়ে পুরুষ বাচ্চা সব রাস্তায় রাস্তায় পড়ে আছে, তাদের সৎকার করার উপায় নেই—জার্মান ফ্যাশিস্টদের হুকুম! পশু, পশু, পশু ওরা।" উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন। তারপর আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "তুমি অনাহারে মৃত্যু দেখায় অভ্যস্ত—নয়?"

"হ্যাঁ বিশেষ করে আমি বাংলা দেশের মানুষ, একটা দুর্ভিক্ষেই আমাদের প্রায় আধ কোটি মানুষ মরেছে—১৯৪৩ সালে আমাদেরও রাস্তায় অমনি স্তূপাকার হ'ত মৃতদেহ"—আমি উত্তরে বললাম।

"কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যু আরও সাংঘাতিক, আরও ভয়াবহ। প্রতিমুহূর্তে মাথার ওপর বোমারু গজরাচ্ছে আর ধূলোর সংগে মিশিয়ে দিচ্ছে ঘর, বাগান, মানুষ"—উনি ব'লে চললেন:

"আমি সে সময় পালিয়ে আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিই। সেই ভয়ঙ্কর কিয়েভে ফেলে যেতে হয় আমার স্ত্রী আর মেয়েকে। তারপর কয়েক বছর কাটে পথে পথে। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি থেকে ফ্যাশিস্ট বর্বরদের তাড়াতে তাড়াতে আবার কিয়েভে পৌঁছোই। শ্মশানের মত স্তব্ধ কিয়েভ। একটি আলো নেই। একখানা ইঁটও যেন সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই। বহুদিন খবর পাইনি আমার পরিবারের। কত কল্পনাই করেছি। মেয়েটি হয়ত কত বড় হয়েছে। আমাকে হয়ত চিনতেই পারবে না।

"যখন শহরে খোঁজ করলাম কেউ বলতে পারল না কিছু। রাস্তায় রাস্তায় খুঁজে বেড়াচ্ছি—পুরনো বাড়ীর যদি কোন নিশানা পাই। যখন অনেক খোঁজার পর বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছলাম, তখন কথা বলার ক্ষমতা আমার লোপ পেয়ে গেছে। একটা ইঁটের ওপর বসে আছি, দেখি দূরে একটি ছোট্ট ছেলে আকুল হয়ে কী খুঁজছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী খুজছো বাছা?' বলল,

'বাবাকে'। বলে কেমন করে যেন আমার দিকে চেয়ে রইল। উঠে গিয়ে তার হাত ধরে বললাম—'চল, আমরা দুজনে মিলে খুঁজি।' তারপর বহু খোঁজাখুঁজি করেও আমরা দুজনে দুজনের কাউকে খুঁজে পেলাম না। শেষকালে সরকারীভাবে জানতে পারলাম আমার স্ত্রী ও মেয়েকে ফ্যাশিস্টরা খুন করেছে। ছেলেটিরও পরিবারের কেউ বেঁচে নেই।

"কাঁদতে পারিনি। অতটুকু ছেলে সেও কাঁদেনি; শুধু আমার হাত ধরে বলেছিল, 'কোথায় যাবো এবার আমরা?' তাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে বলেছিলাম, 'কেন, তুমি যে এখন থেকে আমার ছেলে।' ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আমি সৈন্যবাহিনীতে ফিরে গেলাম। এক আশ্চর্য ভালবাসা গড়ে উঠলো আমাদের মধ্যে। আমার মেয়ের প্রতি আমার যে ভালবাসা, সে ভালবাসা এক ধরণের। ঠিক তার মত করে আমি কখনও কাউকে ভালবাসতে পারব না। আমার এ কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলেটির প্রতি আমার যে ভালবাসা, তারও টান কিছু কম নয়।—মানুষের ভালবাসা কী বিচিত্র আর ভালবাসার কি অসম্ভব ক্ষমতা আছে আমাদের! সোভিয়েট ইউনিয়নের ঘরে ঘরে আজ এমনি মাবাপ-মরা ছেলেমেয়েরা নতুন বাসা খুঁজে পেয়েছে। কমরেড স্তালিনও অন্যান্যদের মত এমনি শিশুদের নিজের পরিবারে স্থান দিয়েছেন, তাদের নিজের সন্তানের মত মানুষ করছেন। আমাদের সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থা মানুষের বহুমুখী ভালবাসার উপযুক্ত প্রসারের সুযোগ দেয়।"

ভদ্রলোক থামলেন। কিয়েভের আলো তখন মিলিয়ে এসেছে। সেদিকে চেয়ে বললেন—"হিটলার ভেবেছিল বলশেভিকবাদকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেবে। কিয়েভের আলোকে নাৎসিবাদের পাদপ্রদীপ করতে চেয়েছিল। সে আলো কোনদিন দস্যুদের জন্যে জ্বলেনি। তারা চার বছর কানা হয়ে ছিল। যুদ্ধের পর ধূলো থেকে নতুন কিয়েভকে গড়ে তোলা হল। নিভে-যাওয়া আলো আবার দপ্ করে জ্বলে উঠে সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থার জয় ঘোষণা করল। পৃথিবীর কোন জায়গায় এত তাড়াতাড়ি একটা গোটা শহর কেউ গড়তে পেরেছে? দেখে বিশ্বাস হবে চার বছর আগে কিয়েভ ছিল শুধু ধ্বংসস্তূপ?" আমি

যেমন ১৯১৭ সালে শহীদ বাপের নাম রাখতে কিয়েভের আলো জ্বালার কাজে হাত দিয়েছিলাম, এখন আমার ছেলে সেই একই কাজ করছে। কিয়েভের আলো চিরদিন জ্বলবে।”

জায়গাটা নিঝুম। কেবল যন্ত্রের একঘেয়ে আওয়াজ আসছে। আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক আপন মনে বললেন, “আমার মেয়ে বেঁচে থাকলে প্রায় তোমাদের মতই হত—হয়ত বা অমনি চঞ্চল হত সে—আমার ছোটবেলাকার মত।”

অনেক রাত হয়েছে। পথের যেন শেষ নেই। যাত্রীরা সব ঝিমিয়ে পড়েছে। যন্ত্রটা গোঙাতে গোঙাতে চলেছে। আমার মনের মধ্যে শত চিন্তার মধ্যে জেগে উঠছে একটি কথা—“কী বিচিত্র মানুষের ভালবাসা—আর ভালবাসার কী অসম্ভব ক্ষমতা আছে আমাদের।”

রাত দুপুরে মস্কো পৌছলাম। ইচ্ছে ছিল কিয়েভের ভদ্রলোককে বিদায় জানাব। কিন্তু কিছু ভাববার আগেই সকলে নেমে গেল। বাকি রইলাম শুধু আমরা দুজন। বলা বাহুল্য দুজনেই মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ছিলাম। মস্কোর মাটিতে দাঁড়িয়ে একটু চঞ্চল হবারই কথা।

আমাদের নিতে এসেছে সোভিয়েট ফ্যাশিস্ট-বিরোধী নারী সমিতির তরফ থেকে। “এত সুন্দর দেশ, কিন্তু ঠাণ্ডায় যে জমে গেলাম”—হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে বললাম তুরাণকে। আমাদের দোভাষী আমার গায়ে একখানা কম্বল চাপিয়ে দিয়ে অদ্ভুত ইংরেজিতে বললেন, “তোমার কষ্ট হবে। রোদ তো তেমন থাকে না বছরের এ সময়। সাইবেরিয়াতে আরও শীত। অবশ্য মস্কোতে এবার শীতই পড়েনি। তোমরা আসবে জানতে পেরেছিল বোধহয়।” সশব্দে হেসে উঠল সকলে।

কাল ৬ই নভেম্বর। তাই আজ থেকে শহরের চোখে ঘুম নেই। পরশু রুশ বিপ্লবের তারিখ। সোভিয়েট ইউনিয়নের সবচেয়ে প্রিয় দিন।

বিরাট চওড়া রাস্তা, বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নিলেও যেন জায়গা থেকে যায়।

শহরের খোলা পথ রেড স্কোয়ারে গিয়ে মিশেছে। জমকালো আলো জ্বলছে চারিদিকে। মস্ক্‌ভা নদীর গা বেয়ে চলেছি। দূরে ক্রেমলিনের চূড়ো দেখা যাচ্ছে। ছ'টা চুণীর তারা ছ'টা মিনারের মাথায় ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে। বাঁ দিকে ঝাপ্‌সা আলোয় দেখলাম—সম্রাট আইভানের তৈরী বিচিত্র সেই গীর্জা—এই ঝাপ্‌সার মধ্যেও পরিষ্কার দেখা যায় গীর্জার গায় নানা রঙের মিনা-করা ইঁট।

সেদিন হোটেল মেট্রোপোলের চন্দনকাঠের কারুকার্য করা প্রশস্ত গরম ঘরে চোখে ঘুম ছিল না। জানলার কাছে রাতভোর দাঁড়িয়ে ক্রেমলিনের লাল আলো ঠিকরানো ছ'টা তারার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থেকেছি। তুনিয়ার সর্বহারাদের অধিকারের বনিয়াদ ঐখানে সবচেয়ে দৃঢ়। আর ঐ লাল তারার নিচে এই ভোর রাতে স্তালিন কি ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি সংগ্রামের কথা ভাবছেন?

মস্কো

ক্রেমলিনের ঘড়িতে চারটে বাজল। রেড স্কোয়ারে সাদা পুরু বরফের ওপর প্রায় আধ মাইল লম্বা ধূসর রঙের জামাকাপড় পরা মানুষের একটা লাইন। অঁাকাবাঁকা লাইনের মাথাটা চলে গিয়েছে লেনিনের সমাধির ভেতরে; যারা ঢুকছে, তারা অন্য একদিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। নতুন লোক এসে আবার লাইনকে বাড়িয়ে তুলছে। এ লাইনের শেষ নেই।

১৯২৪ সালে লেনিন মারা গিয়েছেন। আজ এত বছর পরেও কেন সোভিয়েট ইউনিয়নের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তের মানুষ ঝড়-জল-বরফ অগ্রাহ্য করে লেনিনের মৃতদেহের সামনে নিজেদের কৃতজ্ঞতা জানাতে আসে, তা ভেবে আগে অনেক সময় অবাক লেগেছে। সোভিয়েট দেশে গিয়ে তার জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তবেই বুঝেছি—লেনিনের বই পড়ে তাঁর প্রতি যে

অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আর ভালবাসা সমস্ত নিপীড়িত মানুষের মনকে আজ তোলপাড় করছে, তা আরও কত তীব্র হয়েছে লেনিনবাদের বাস্তব পরিবেশে।

একবার স্তালিনকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, "লেনিনকে কি মহামান্য পিটারের সঙ্গে তুলনা করা চলে?" উত্তরে স্তালিন বলেছিলেন, "এ যেন সমুদ্রের সঙ্গে একবিন্দু জলের তুলনা।"

সোভিয়েট দেশে লেনিনবাদের জয় দেখলে লেনিনকে সমুদ্রের চেয়েও বড় কিছুর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়।

আমরা লাইনের সঙ্গে মিশে গেলাম। অতিথি বলে ওরা আমাদের সামনের দিকে ঠেলে দিল। আমরা আস্তে আস্তে সমাধির মধ্যে ঢুকছি। সব স্তব্ধ। শুধু অসংখ্য মানুষের সাবধানে পা ফেলার একটা খস্‌খস্ শব্দ কানে আসছে। যে ঘরে কাঁচের কবরে লেনিনের দেহ রাখা হয়েছে, সে ঘর থেকে লাল আলোর আভা চোখে পড়ল। ও ঘরে লেনিন!

লেনিন। ডান হাত শক্ত মুঠো করে বুকের ওপর রাখা। বাঁ হাতে যেন কী ধরেছিলেন একটু আগে—এমনি সজাগ আঙুলগুলো। ভুরু জোড়ার মাঝখানে গভীর একটা দাগ! চোখ বন্ধ করে কী যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন। চওড়া কপালে লাল আলোর আভা পড়েছে। লেনিন! আমাদের লেনিন!

"অন্ধকার থেকে লেনিন গড়লেন ফলের বাগান
মৃত্যু থেকে জীবন।
সমস্ত রথীমহারথী এক হলেও তাঁরই শক্তি বেশী
কেন না তারা যা হাজার বছরে ভেঙেছে
একা তিনি ছ' বছরে তা গড়েছেন।
আরও কত যুগ যাবে
লোকে আর মরুভূমি দেখবে না, থাকবে না মৃত্যুর ভয়
যুদ্ধকে তারা ভুলে যাবে।
কিন্তু রক্তাক্ত স্মৃতির মধ্যে শিউরে উঠে

পৃথিবী যুদ্ধকে মনে রাখবে
আর মনে রাখবে তাঁকে, যিনি যুদ্ধকে খতম করেছেন।"
(উজবেক লোক-কবি)

কখন বেরিয়ে এসেছি সকলে। ক্রেমলিনের ঘড়িতে পাঁচটা বাজার আওয়াজ কানে এল। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া লাল মেঘ। মস্কোর রাস্তা পার হতে হতে আমি বুক ভরে একটা প্রকাণ্ড নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম, "আঃ— এমন প্রাণ-খোলা রাস্তা। কী ভালই যে লাগছে।" স্তালিন কারখানার বড় বড় গাড়ীগুলোর গতিবিধির ওপর ভয়-খাওয়া চোখ জোড়া রেখে প্রাচ্যের এক সহযাত্রী আঁতকে উঠে বললেন, "রক্ষে কর। কাজ নেই আমার প্রাণ-খোলা রাস্তায়। এদিকে প্রাণ বেরিয়ে যাবার যোগাড়। আমাদের দেশে এমন রাস্তা হলে মানুষগুলো চাপা পড়ে পড়েই অর্ধেক কাবার হয়ে যাবে। না বাপু, মস্কোর এ মাঠের মত রাস্তা আমার পছন্দ হচ্ছে না।"

আসার আগে পশ্চিম-ইউরোপের জনকয়েক অ-কমিউনিস্ট বন্ধু পই পই করে বলে দিয়েছিলেন সোভিয়েটে আমি যেন নিজের প্রোগ্রাম নিজে ঠিক করি। নয়তো মস্কোওয়ালারা নাকি ঠকিয়ে শুধু ভাল ভাল জিনিসগুলো দেখাবে। চোখ কান যেন খোলা রাখি এবং বেশী কথা না বলাই ভাল। যেন সাইবেরিয়ার "লেবার ক্যাম্প" সম্বন্ধে নিশ্চয়ই জেনে আসি। ছলেবলে অসন্তুষ্ট লোকদের যেন খুঁজে বার করি ইত্যাদি। পশ্চিম-ইউরোপে সোভিয়েট-বিরোধী প্রচার এত উচ্চকণ্ঠ যে সাধারণ মানুষের এ-ধরণের চিন্তা মাথায় আসেই।

মস্কোয় অসন্তুষ্ট লোক পাওয়া মুশ্‌কিল। সবাই দিব্বি খেয়ে প'রে ব্যালে-থিয়েটার দেখে কাজেকর্মে দিন কাটাচ্ছে। অবশ্য অসন্তোষ ওদের খুবই আছে, তবে তা সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয়, ইঙ্গ-মার্কিনীদের জঘন্য প্রচারের বিরুদ্ধে। একজনকে শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচ্ছা, তোমাদের দেশে শতকরা নিরানব্বইয়ের ওপর এবার স্তালিনকে ভোট দিয়েছে। আমাদের ওদিককার কাগজে বলে এতে নাকি সরকারী চাপ আছে।" যাকে বলেছিলাম, সম্ভবত সে মজুর। "কী—?" বলে এমন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল যে আমি বেশ ঘাবড়ে

গিয়েছিলাম। সে একটু সামলে নিয়ে উত্তেজনায় আমার হাতখানা ধরে বলেছিল, "শোন কমরেড, স্তালিনকে কেন আমরা ভোট দিই তা ওদের বোঝানো সম্ভব নয়। যারা দিনভোর মানুষ মারার স্বপ্ন দেখে, তারা স্তালিনকে বুঝবে কী করে? তাঁকে আমরা বুঝি, তিনি আমাদের একান্ত আপনার জন। এতবড় স্পর্ধা—বলে কি স্তালিনকে ভোট দিতে আমাদের ওপর চাপ দিতে হবে?" বলে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল আবার—"দেশে গিয়ে আমাদের কথা ব'লো; এসব বাজে প্রচার লোককে বিশ্বাস করতে বারণ ক'রো। এ তোমার পবিত্র দায়িত্ব। স্তালিনের নেতৃত্বে আমরা কী পেয়েছি সবাইকে ব'লো।" সে এবার তার বন্ধুত্বপূর্ণ হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। ঝাঁকানিতে মনে হল হাত আমার খসে পড়বে। দেশে আমার ধারণা ছিল আমার কব্জিতে খুব জোর। কিন্তু রুশদের সঙ্গে করমর্দন করতে গিয়ে প্রতিবারই মনে হয়েছে আমার কব্জি বুঝি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে তৈরি।

ঘুরবার প্রোগ্রাম ঠিক করতে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী সোভিয়েট নারী সমিতির সঙ্গে আলাপ করতে গেলাম। প্রতিষ্ঠানের সহ-সভানেত্রী কমরেড পারভিওনোভা রুশ কায়দায় দু'গালে চুমো খেয়ে বললেন, "তারপর? কি কি দেখতে চাও এখানে? নিজেরা ঠিক করে নাও।" আমরা জানালাম যে, যেহেতু সেদিন ৬ই নভেম্বর, আমরা মস্কোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে চাই। যেখানে ইচ্ছে যেতে চাই। শুনলাম সেদিন রাতেই আমাদের মস্কো ছাড়তে হবে। কারণ, চীন থেকে জরুরী তলব এসেছে, সারা এশিয়া নারী সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজে আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। অথচ আগামী পাঁচদিনের মধ্যে আর কোন ট্রেন নেই চীন যাবার। ফলে আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লাম। রেড স্কোয়ারে ৭ই নভেম্বর স্তালিনকে দেখব, এ-ইচ্ছে পেয়ে বসেছিল। বললাম, "তাহলে স্তালিন? স্তালিনকে যে দেখা হবে না।" পারফিওনোভা আমাদের পরণে যথেষ্ট গরম জামা আছে কিনা পরখ করে দেখতে দেখতে বললেন, "তাঁকে ফেরার পথে দেখ। আর তখনও যদি দেখা না হয়—আবার এস। এ দেশের দরজা তোমাদের জন্যে তো সব সময় খোলা।"

আমরা চললাম পথে পথে লেনিন-স্তালিনের দেশের মানুষের সঙ্গে আলাপ

জমাতে। সঙ্গে দোভাষী নীনা বগমোলোভা—আমার বিশেষ বন্ধু। বিভিন্ন সম্মেলনে দুজনে এক সঙ্গে কাজ করেছি। নীনাকে দেখলে মনে হয় এক-ফোঁটা সুন্দর ইস্কুলের একটা মেয়ে। মিশলে বোঝা যায় ঐ এক-ফোঁটা মেয়ের জীবনে কত ব্যথা, কত অভিজ্ঞতা। একবার লণ্ডনের কাগজে নীনা সম্বন্ধে নাকি লিখেছিল যে, রুশ মহিলা প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ফ্যাশিস্ট-বিরোধী নারী সমিতির প্রতিনিধি একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আনা হয়েছে অবশ্য ফ্যাশিজম্‌কে সে চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ। কথাটা বলতে বলতে নীনার চোখ জ্বলে উঠেছিল। শেষে বলেছিল, "কী স্পর্ধা এদের। আমার বাপকে, ভাইকে ফ্যাশিস্টরা মেরেছে। সে সময় আমি মস্কোয়। আমি খুব ছোট ছিলাম। কিন্তু প্রতিহিংসার আগুন আমার বুকে জ্বলত। আমি মস্কোকে রক্ষার কাজে আমার যথাসাধ্য করেছি। বলে ফ্যাশিজমকে চোখে দেখিনি—আশ্চর্য! সোভিয়েটে এমন কে আছে যে যুদ্ধের সময় নিদারুণ আঘাত পায়নি? ওরা মানুষের শোককে সম্মান করতে জানে না।"

আজ ৬ই নভেম্বর। চারিদিকে আলো আর ফেস্টুন। শান্তি ওদের জয়ধ্বনি। সমস্ত শহর জুড়ে লালের উপর সোনালী অক্ষরে লেখা আছে—"মীর্, মীর্, মীর্," অর্থাৎ "শান্তি, শান্তি, শান্তি।" ১৯১৭ সালে মস্কোয় সেদিন কী তোলপাড়! পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের অনর্থক রক্তক্ষয়ের গ্লানি মুছে ফেলার অভিযানের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

পথের লোক থেমে থেমে আমাদের সঙ্গে ভাব জমাতে লাগল। "ইন্দিস্কাইয়া! —ভারতীয়!"—চোখ বড় বড় করে অনেকে দেখতে লাগল। কেন জানি না আমাকে দেখলেই ওরা জিজ্ঞেস করত শীত করছে কিনা। সম্ভবত কালো রং দেখলেই সূর্যের কথা মনে হত ওদের।

দেখলাম রাস্তায় বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা: "কাভিয়ার খাও"। মস্কোয় বিজ্ঞাপন! একটু দমে গেল মনটা। জিজ্ঞেস করে জানলাম, এদের বিজ্ঞাপন বিক্রি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় না, স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করে দেওয়া হয়। "কাভিয়ার খাও" বা "শব্জি খাও" বলার আজও দরকার। কারণ মস্কোয় বহু লোক বাইরে

থেকে আসে, যারা হয়তো এমন এলাকায় থাকে যেখানে শক্তিটা আজও চল নয়। সেটাকে চালু করার জন্যে, তাদের খাবার যথেষ্ট পুষ্টিকর করার উদ্দেশ্যে এইসব বিজ্ঞাপন। "কাভিয়ার" একরকম মাছের ডিম। অত্যন্ত পুষ্টিকারক এবং দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র সুস্বাদু খাবার হিসেবে এর নামডাক আছে। এটা রুশ দেশের বিশেষত্ব। আমাকে এক প্লেট ভরে দিয়েছিল। ভেবেছিল ঔপনিবেশিক দেশের মেয়ে—স্বাস্থ্যটা ভাল করে নেওয়া দরকার। কিন্তু আমি এক চামচও খেতে পারিনি। এমন বিশ্রি লেগেছিল যে ওঁদের সাগ্রহ "কেমন লাগল"র উত্তরে চিঁ চিঁ করে "মন্দ কি!" বলতে গিয়ে চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠেছিল। পরে ঘটনাটি সম্বন্ধে এক রুশ বান্ধবীকে বলাতে সে বলেছিল, "খাবারের ব্যাপারে ভারতীয়দের চেয়ে নাক-উঁচু আমি কাউকে দেখিনি। ঐ বারুদ গুঁড়ো (অর্থাৎ লঙ্কা গুঁড়ো) খেয়ে খেয়ে তোমাদের আর কিছুতে স্বাদ লাগে না।"

ঠিক হল পুশ্‌কিন স্ট্রীট ধরে আমরা বরাবর মস্ক্‌ভা নদী অবধি গিয়ে তারপর অন্যান্য রাস্তাগুলো ঘুরবো। উঁচু উঁচু আধুনিক বাড়ী। শুনলাম এখানে এমনি সব বাড়ী আগে ছিল না। ছিল ঘিঞ্জি বস্তির মত এলাকা। রাস্তা ছিল সরু আর নোংরা। নীনা প্রায় আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদে বসল। বলল যে, রাস্তা চওড়া করার জন্যে ওদের অনেক বাড়ী ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। কিন্তু যেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য ছিল সে সব বাড়ী ওরা যন্ত্র দিয়ে তুলে সরিয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম, "ইঁট কাঠ নিয়ে সব খুলে নতুন জায়গায় নতুন ভিতের ওপর বুঝি ঢেলে সাজিয়েছে?" বলল, "তা কেন? একেবারে শেকড় শুদ্ধু, মাটি শুদ্ধু আস্ত বাড়ী তুলে তুলে সরানো হয়েছে। এ তো আখ্‌ছার হচ্ছে এখানে।" এমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, বিশ্বাস করব এ শক্তি ছিল না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না ঘটনাটা। হাত বাড়িয়ে একজন দেখাল, "ঐ ছ্যাখ, ঐ বাড়ীটা। রাস্তার মাঝখানে গোঁয়ারের মত দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা ওকে সরিয়ে দক্ষিণমুখো করে দিয়েছে।" যখন বিশ্বাস হতে লাগল তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম—আমাদের দেশের অমনি কত বাড়ীকে দক্ষিণমুখো করার দরকার হবে। আমাদের আর একজন সঙ্গিনী বললেন, "মস্কোর

পুনর্গঠন এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল যে, যুদ্ধের শেষে যেদিন জার্মান যুদ্ধ-বন্দীদের রাস্তায় বার করা হল, তারা অবাক হয়ে হেঁট মাথা তুলে তুলে চারিদিক দেখছিল। তারা বোমা দিয়ে যে সব বাড়ী ভেঙেছে, তার কোন চিহ্ন সেদিন তারা দেখতে পায়নি। ঐ যে দেখছ প্রকাণ্ড প্রাসাদ—এগারো মাসে তৈরি করা হয়েছে। সোভিয়েটবাসীরা কোনদিন মস্কোর বুকে ক্ষত সহ্য করবে না। প্রয়োজন হলে সারা ইউনিয়ন থেকে লোক আসত মস্কো গড়ার কাজে।"

আমরা মস্কোর মেট্রো দেখব বলে জানালাম। "মেট্রো" মানে ওদের মাটির নিচের, শহরের মধ্যেকার ট্রেন। এর খ্যাতি তুনিয়া জুড়ে। মায়াকোভ্স্কি স্টেশনে আমরা টিকিট কাটলাম। ইলেকট্রিকে আপনি সিঁড়ি ওঠানামা করছে। একদিক দিয়ে সার বেঁধে লোকে উঠছে, অন্যদিকে আর একটা সিঁড়ি দিয়ে নামছে। আমরা নামার সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়াতেই সোঁ সোঁ করে নিচে নেমে চললাম। নাগরদোলা চেপে পাতালে যাবার মত লাগতে লাগল। সিঁড়ির ধারে ধারে বড় গোল সারি সারি আলোগুলো কানের পাশ্ কাটিয়ে হু হু করে সরে যেতে লাগল। প্যারিস বা লণ্ডনের মেট্রোর সিঁড়িগুলো এমন জল্দি চলে না। আর তাদের মেট্রোর চারিধারে এমন চোখ-ঝল্সানো পাথর আর আলো নেই।

এ তো সীতার পাতালপ্রবেশ নয়, স্বর্গারোহণ। সিঁড়ি থেকে নেমে দেখি সামনে প্ল্যাটফর্ম। বড় বড় ঝকঝকে মার্বেল পাথরের থামের পাশে নানা ধরণের পাথরের মূর্তি। চারিদিক এত ঝকঝকে তক্তকে যে কিছুতেই সে-মুহূর্তে মনকে হাওড়া অথবা শেয়ালদা'র দিকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত দেয়াল জুড়ে 'ফ্রেস্কো' করা। মূর্তিগুলোর কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। রুশ সর্বহারা বিপ্লবের ইতিহাস এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি মূর্তিগুলোর মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবি মায়াকোভস্কির নামে এই স্টেশন। এ সম্মান সত্যিই কবিজনোচিত। সোভিয়েট আর্ট সৃষ্টির কাজে মায়াকোভ্স্কির দানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসার প্রতীক এই মেট্রো স্টেশন (কিম্বা আর্ট গ্যালারী)। আমাদের রবীন্দ্রনাথকে আমরা আজ শুধু মৌখিক সম্মান দিয়েই খালাস। ওদের পুশ্কিনের জন্মতিথিতে সারা ইউনিয়নে উৎসবের ঝড়

বয়ে যায়। পুশ্‌কিন স্ট্রীটের মাথায় পুশকিনের বিরাট মূর্তির সামনে অজস্র ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, মা আসে ফুল দিতে। কারখানা, যৌথ খামার, ইস্কুল, কিশোর-প্রাসাদ—সব জায়গা থেকে আসে কবিতা, গান, চিঠি—সব স্তূপাকার হয় পুশ্‌কিনের মূর্তির নিচে।

মস্কো মেট্রো নিয়ে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় অনেক কথা হয়েছে। ওদের স্থপতিরা বলে, মস্কোর মেট্রোয় যে পরিমাণ খরচ করা হয়েছে তাতে নাকি বহু ঘরবাড়ি করা সম্ভব হত। সে সময়ে খুব বেশী প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকারের এ ধরণের "খামখেয়ালী" মেট্রো বানানোকে তাঁরা ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু সুন্দর উত্তর দিয়েছেন এঁরা। এঁদের মতে, সোভিয়েটের মানুষকে যে সময় হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও ভাল বাসস্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি, সে সময় এই ঐশ্বর্যশালী মেট্রো দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে মেট্রোকে সুন্দর করার কারণ হল, যাতে প্রতিদিন এই জাতীয় সম্পত্তি দেশের লোক যৌথভাবে উপভোগ করতে পারে। কাজে যাওয়া-আসার পথে এই স্নিগ্ধ পরিবেশে তাদের মন গর্বে ভরে ওঠে। তাদের কাজের স্পৃহা বাড়ে। দুঃখের দিনে জাতীয় ঐশ্বর্যকে আপনার করে পাবার এর চেয়ে ভাল উপায় তারা খুঁজে পায়নি।

সেদিন অনেক রাতে মস্কো ছেড়ে চলে যেতে হল আমাদের। পরে চীন থেকে ফেরার পথে মস্কোয় আবার কিছুদিন থাকবার সুযোগ মিলল। আশী লক্ষ অধিবাসীর এই শহরে দেখ্‌বার জিনিসের অভাব নেই।

ভোর বেলা থেকে রাত বারটা অবধি আমরা ঘুরতাম। যেদিন সকালে হয়তো গেলাম কিশোর-প্রাসাদে, দুপুরে গেলাম জাভা তামাক-কলে আর সন্ধ্যে-বেলায় বাল্‌শয় থিয়েটারে ব্যালে নাচ দেখতে। এরই মধ্যে হয়ত কোন মজুর পরিবারে বেড়িয়ে এলাম। এত দেখতাম তবু আশ মিটত না। ঘুরে ঘুরে সারা দুপুর লেনিন মিউজিয়ামে কাটাতাম কোনদিন, বিরাট মস্কো বিদ্যালয়ের সামনে ঘুরে বেড়াতাম বা ওদের আর্ট গ্যালারীর সামনে বীর কিশোরী জোয়া কস্‌মোডেম্‌ইয়ান্‌স্কায়ার মূর্তির নিচে দাঁড়িয়ে মস্কোর অধিবাসীদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতাম।

সেদিন গিয়েছি শিশুরক্ষণাগারে। বাচ্ছাদের স্বাস্থ্য যেন উপ্‌ছে পড়ছে। আপেলের মত চকচকে লাল গালের চাপে নীল চোখগুলো ছোট ছোট দেখায়। তাদের খেলার ঘরে ঢুকে আমরা একটু অবাক হলাম। পরিপাটি করে সাজানো খেলনা পুতুল। দেখলে মনে হয় আমাদের দেখবার জন্যে গুছিয়ে রেখেছে ঘর। এসব খেলনা নিয়ে বাচ্ছারা খেলে কিনা জিজ্ঞেস করতে জানা গেল, এগুলো নিয়ে ওরা খানিক আগেও খেলেছে। তিন চার বছরের বাচ্ছারা পুতুল না ভেঙে খেলতে পারে একথা বিশ্বাস করা শক্ত। শুনলাম পুতুলকে যত্ন করতে শেখানো এদের শিক্ষা-পদ্ধতির একটা অঙ্গ। পুতুলকে ভিত্তি করে বাচ্ছাদের মধ্যে মানুষের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান, মানুষকে আঘাত না করা ইত্যাদি শেখানো হয়। পরে একটি ফিল্ম দেখলাম এ বিষয়ে। বাচ্ছাদের জন্যে তৈরী বহু শিক্ষামূলক ফিল্মের একটি গল্পের বিষয় হল যে একটি নির্দয় ছোট্ট মেয়ে তার পুতুলদের পাওয়ামাত্র মট্‌মট্‌ করে হাতপা ভেঙে ফেলত। একদিন রাতে সব পুতুলরা জোট পাকিয়ে তাকে শাস্তি দিতে দুষ্টু মেয়েটি বুঝতে পারল তার হাতে পড়ে পুতুলদের কি দুঃখু। আর একটি ফিল্মে দেখলাম শিশুমনে আন্তর্জাতিক বোধ এনে দেবার কী আন্তরিক চেষ্টা সোভিয়েট ইউনিয়নে। একটি ছোট্ট মেয়ের মা তাকে একটি নিগ্রো পুতুল কিনে দেয়। পুতুলটি মার্কিণ দেশ থেকে আসছে। তার মুখখানা কাঁদো কাঁদো। তার মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে বাচ্ছাটি সারারাত ধরে স্বপ্ন দেখছে—তার শিশুমন অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিগ্রো পুতুলের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলছে। বর্ণ-বৈষম্যকে মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলেছে সোভিয়েটের শিক্ষাব্যবস্থা।

এই সব বাচ্ছাদের বাপমায়েদের সঙ্গে অনেক জায়গায় আলাপ হল। আজ সোভিয়েট শ্রেণীহীন সমাজ। কাজেই মজুর বা চাষীর ছেলের সঙ্গে একজন বুদ্ধিজীবীর ছেলের তফাৎ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষের যোগ্যতা অনুসারে সে মাইনে পায়। নিজের বিশেষ গুণের চর্চা করবার সমস্ত রকম সুযোগ আছে মানুষের। এ দেশে যে মা যত বেশীসংখ্যক সন্তানকে ভালভাবে মানুষ করতে পারবেন, তিনি রাষ্ট্রের কাছে পাবেন পুরস্কার।

এ ছাড়া সন্তান-পালনের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রের কাছে যে কোন মায়ের প্রাপ্য।

জাভা তামাক কলে বহু মেয়ে মজুর, ইঞ্জিনিয়ার, ডিরেক্টর, কেরাণী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হল। কারখানায় শতকরা আশী ভাগের ওপর মেয়ে। সবাই শিক্ষিত। সকলেরই শিশুরা মায়েদের কাজের সময় থাকে কারখানার শিশুরক্ষণাগারে। আমাকে আদর করে এঁদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন অনেকে। সাধারণ মজুর থেকে ডিরেক্টর, অনেকের বাড়ীতেই গেলাম। বড় বড় বাড়ীর মধ্যে পরিষ্কার ছোট ছোট ফ্ল্যাট্। সংসারে লোক সংখ্যার ওপর ঘরের সংখ্যা নির্ভর করে। একজন মজুর মেয়ে নিজের জীবনী বললেন। কী করে তাঁর বাপ-মা জারের আমলের ক্রীতদাসত্বের জীবন খতম করে তাঁকে সোশালিস্ট সমাজব্যবস্থায় একজন বিশেষজ্ঞ হবার সমস্ত সুযোগ দিয়েছেন। সোভিয়েটে মেয়েদের জন্যে সমস্ত সুযোগ আছে। অন্যান্য দেশে যে কারণে মেয়েরা দাসী, সে কারণটি এদেশ থেকে লুপ্ত করায় এখানকার মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। মেয়েরা সামাজিক উৎপাদনে ছেলেদের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে অংশ গ্রহণ করেন। সোভিয়েটে যত ডাক্তার আছে, তার অর্ধেকের বেশীর ভাগ মেয়ে। সৃষ্টিশীল উৎপাদনে মেয়েরা যাতে ভালভাবে কাজ করতে পারেন, তার জন্যে প্রসবের জন্যে আছে আড়াই মাস পুরো মাইনেসহ ছুটির ব্যবস্থা, প্রসবের জন্যে বিশেষ ভাতা আর শিশুকে রেখে কাজ করতে যাবার জায়গা। এই সব শিশুরক্ষণাগারে বিশেষ শিক্ষিত দাইরা আছেন। কোন কোন মায়েরা শুধু কাজের সময়টুকু বাচ্ছাকে শিশুরক্ষণাগারে রেখে যান। কিন্তু যাঁরা কোন বিশেষ গবেষণায় লিপ্ত, অথবা যাঁদের ঘোরাফেরার কাজ করতে হয় তাঁরা সপ্তাহে একবার করে শিশুকে কাছে আনেন। মায়ের প্রয়োজনমত শিশুপালনের সমস্ত ব্যবস্থা আছে সোভিয়েটে।

মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই সব শিক্ষিতা মায়েদের সন্তানরাও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠছে। তারা একদিকে যেমন নিজের দেশকে ভালবাসতে শিখছে, অন্য দিকে তেমনি অন্যান্য দেশের মানুষের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। কিশোর-প্রাসাদগুলোয় সোভিয়েট দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের

দেখা মেলে। দেশের সব চাইতে সেরা বাড়ীগুলো দেওয়া হয়েছে কিশোরদের।

আমরা যখন মস্কোয়, তখন মালয় দেশে বৃটিশ অত্যাচার চরমে উঠেছে। সাংহাইতে আবার বোমা ফেলেছে মার্কিণরা। মাও সে-তুং তখন মস্কোয়, শান্তি আর বন্ধুত্বের চুক্তি সই করতে এসেছেন। সারা সোভিয়েটে ভ্রাতৃত্ব আন্দোলনের ঝড় বইছে। কিশোররা আকুল হয়ে বড়দের জিজ্ঞেস করছে—"আচ্ছা, আমাদের কি সরকার মালয় কিম্বা ভিয়েটনাম কিম্বা চীনে ভলান্টিয়ার হয়ে যেতে দেবে না? তাহলে আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের দেখিয়ে দিতাম মজাটা। আমাদের ভাইদের মারছে তো আমাদের কষ্ট হয় না?" বড়রা তাদের বোঝাত যে ভলান্টিয়ার না হয়েও নিপীড়িত বিদেশী ভাইদের সাহায্য করা যায়। ভ্রাতৃত্ব আন্দোলন গড়ে তুলে উদাহরণ সৃষ্টি করা দরকার।

সে সময় খবর এল হায়দ্রাবাদে সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেখানকার জঙ্গী চাষী মজুররা বিরাট প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ছেলে বুড়ো সকলে এক হয়ে দাঁড়িয়ে লড়ছে। শহীদের রক্তে হায়দ্রাবাদের মাটি রাঙা হয়ে উঠছে। তবু হাতিয়ার নামাচ্ছে না জনসাধারণ। সেই লড়াইয়ে বারো বছরের কম বয়সের ছেলে দিনা লিংগাইয়াকে ভারত সরকার ৪৬ বছরের কারাদণ্ড দেয়। খবরটা বজ্রের মত শোনায় সোভিয়েট জনসাধারণের কানে। এদেশের বেশীর ভাগ কাগজ খবরটা বিলকুল চেপে গেল। সোভিয়েটের যুব আর কিশোর সমাজের মন হায়দ্রাবাদ আর দিনা-র জন্যে কেঁদে উঠল। কাগজে, কাগজে তারা লিখতে লাগল প্রবন্ধ, কবিতা, গান—হায়দ্রাবাদের ভাইদের উদ্দেশ্যে। একজন কিশোর, তার সংগঠনের লাল রুমাল আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিল—"হায়দ্রাবাদের জন্যে।" সে রুমাল আমি বহু যত্নে রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু ফরাসী সরকার ফ্রান্স থেকে আমাদের বহিস্কার করার সময় আমাদের এমনভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেয় যে, সে রুমাল সমেত ভারতবর্ষকে দেওয়া প্রায় এক ট্রাঙ্ক বোঝাই উপহার হারিয়ে যায়।

কিন্তু আমার মনে থেকে যায় ওদের লেখা একখানা কবিতা—যে কবিতাকে

আমার মন থেকে "বহিস্কার" করবার মত শক্তি ওদের নেই। কবিতাটি লিখেছে ভিক্টর গোনচারভ বলে সোভিয়েটের অল্পবয়সী একটি ছেলে :

"না!
দুনিয়ায় সে শক্তি নেই যে প্রত্যুষকে থামায়!
শ্রম আর লড়াই থেকে বেরিয়ে আসবে
দুনিয়াজোড়া এক নতুন বছর।
সে এক উপকথার দেশ,
সেই সুদূর হায়দ্রাবাদ।
কারো কাছে বুঝি সে দেশ স্বর্গ,
সাধারণ মানুষের সেখানে নরক-বাস!

ছোট্ট লিংগাইয়া।
বারো বছরও তো পুরো হয়নি তার,
কিন্তু দরকার পড়ে যদি
হাসিমুখে প্রাণ দিতে পারে সে
হায়দ্রাবাদের জন্যে।

বিকেল···
ধারালো বাতাস বিঁধছে···
রাস্তা···
একটা চিৎকার—থামো!
পুলিশ তাকে ধরে নেয়।

নির্জন কারাকক্ষে সূর্য নেই
অন্ধকার ঘন হয়ে আছে।
শুধু মাত্র এগার বছর বয়েস

দিনা লিংগাইয়ার।
ছোট্ট দিনা, ছোট্ট ;
কিন্তু ভারতবর্ষে আছে "মেধা"—
ট্রাইব্যুনাল তাকে
ছেচল্লিশ বছর ঠুকে দেয়।
কেননা সে সানন্দে
প্রাণ দিতে চেয়েছিল
হায়দ্রাবাদের জন্যে।"

মস্কো থেকে চীন

চীন সীমানায় এসে গাড়ী থামল। পেছনে বরফে ঢাকা বিরাট সাইবেরিয়া। সামনে স্তব্ধ মাঞ্চুরিয়া। শূন্যের চল্লিশ ডিগ্রি নিচে তাপ। হু হু করে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে বরফের গুঁড়ো ভেসে আসছে। যতদূর চোখ যায় ধূ ধূ করা শাদা বরফ। মাঝে মাঝে উঁই-ঢিপির মত বরফে ঢাকা বাড়ী আর ছোট ছোট ঢিপি। ঢিপিগুলোর ছায়ায় বরফ মোলায়েম আর নীলচে। আকাশে মেঘ নেই, অথচ ঝড়ের আশঙ্কা আছে এমনি থমথমে চারিদিক।

অসহ্য ঠাণ্ডা। তবু গাড়ী থামতে সকলে নেমে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে—স্তালিনের সোশালিস্ট দেশের সীমানায় দাঁড়িয়ে মাও সে-তুঙের নতুন গণতান্ত্রিক চীন—আশার মত প্রসারিত, অবশ্যম্ভাবী দুটো মহাদেশ।

গাড়ীতে আমরা তিনজন ঔপনিবেশিক দেশের মেয়ে—ইরানী, ভিয়েৎনামী আর ভারতীয়। ফ্যাশিস্ট-বিরোধী সোভিয়েট নারী সমিতির তত্ত্বাবধানে কয়েকটা দিন সোভিয়েট দেশে কাটিয়ে চীনে চলেছি। পাছে পথে খাবার কষ্ট হয়, মস্কো থেকে ওঁরা সঙ্গে দিয়েছেন তিন মণ ওজনের খাবার। গাড়ীতে ইভান্ ইভানোভিচ্ প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর জিজ্ঞাসা করছেন, "ক্ষিধে পায়নি?" বন্ধুটির ওপর আমাদের কামরার তদারক করবার ভার। এ ছাড়া গাড়ীর সব সহযাত্রীদেরই কিছু না কিছু দেবার আছে—ঔপনিবেশিক দেশের মেয়েদের।

আমাদের সঙ্গে চীনে চলেছেন আশী জন সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার, কারখানা গড়ার কাজে চীনা বন্ধুদের সাহায্য করতে। অসময়ের সবচেয়ে বড় বন্ধু সোভিয়েট দেশ। কুড়ি কোটি মানুষের এই মহাদেশ পেরিয়ে চীন সীমানায় পৌঁছতে লাগল গোটা সাতটা দিন। অজগরের মত বিরাট ট্রান্সসাইবেরিয়ার রেলগাড়ী। তার ভেতরে তাপনিয়ন্ত্রিত গরম কামরায় বসে কত ধরনের মানুষের সঙ্গে যে চেনা জানা হল! ভাষার ব্যবধান ভেঙে গেল আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বের অকপটতায়।

উরাল পর্বতমালা পেরিয়ে আমাদের গাড়ী যখন বৈকাল হ্রদের গা ঘেঁষে চলেছে, সাইবেরিয়ার এক অধিবাসী কথা প্রসঙ্গে আমাদের বললেন, "জানো, আমাদের এক পাহাড়ের চূড়োর নাম দিয়েছি আমরা পল রোব্‌সন। আমাদের শিল্পীরা ঐ চূড়ো কেটে রোব্‌সনের মূর্তি গড়বে।" শুনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ভিয়েৎনামী মেয়েটি—ভিয়েৎনামের মুক্তি সংগ্রামে পার্টিজান বাহিনীতে বন্দুক হাতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছে—তার কালো চোখ ছল ছল করে উঠল। নরম ভাঙা গলায় শুধু বললে—"সোভিয়েট দেশ।"

স্ভার্ড্‌লভ্‌স্ক থেকে গাড়ীতে উঠেছেন একদল মজুর। সোভিয়েট মজুর—১৯১৭ সালে যাঁরা পৃথিবীর বুক কাঁপিয়ে তুনিয়ায় নতুন আশার সৃষ্টি করেছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধপ্রচেষ্টার কথা বলতে বলতে তাদের চোখে ফুটে উঠল ভয়ঙ্কর ঘৃণা। গত মহাযুদ্ধে এক কোটি সত্তর লক্ষ সোভিয়েট মানুষকে খুন করেছিল হিটলার—প্রতিটি সোভিয়েট পরিবারে সে মৃত্যু আর ধ্বংসের ছবি আগ্নেয়গিরির মত জ্বলছে। হিটলারকে তারা পরাজিত করেছিল তাদের অসীম সাহসের জোরে। জোরালো গলায় একজন মজুর বললেন, "আমরা শান্তি চাই। মানুষের জন্যে গড়তে চাই। সাইবেরিয়ার বন্ধ্যা জমিকে বিজ্ঞানের সাহায্যে সোনা ফলানো জমি করে তুলতে চাই। আমাদের সমস্ত শক্তি আমরা নিয়োজিত করেছি পরিকল্পনায়। মানুষের সুখের জন্যে আমরা প্রকৃতিকে জয় করেছি। শুনেছ তো আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা—প্রকৃতি জয়ের পরিকল্পনা? কিন্তু আবার ওরা যুদ্ধ সাজ শুরু করেছে। আবার ওরা ভাঙতে চায় লক্ষ লক্ষ ঘর। কোটি কোটি মানুষকে আবার ওরা রক্তে ভাসিয়ে দিতে চায়। সাম্রাজ্যবাদী খুনী—।" রাগে কপালের শির ফুলে উঠেছে বন্ধুটির। ইঙ্গিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখতে বললেন আমাদের। দেখলাম ইস্টিশানের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা আছে, "আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি কিন্তু যুদ্ধবাজ শত্রুকে ভয় করি না।" সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উস্কানীদাতাদের প্রতি সোভিয়েট মানুষের বলদৃপ্ত হুঁশিয়ারি।

আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আলোচনা শুনছিলেন সাইবেরিয়ার কোন বিখ্যাত ইস্পাত কারখানার সচিব। মস্কো যাবেন ইস্পাতের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে।

নোট বইয়ে যত্নে রাখা এক টুকরো ইস্পাত বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আমরা সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়াররা ইস্পাতকে ফুলের মত ভালবাসি। আমাদের ইস্পাত আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। এ গড়ে—ভাঙে না। কিন্তু মানুষের শত্রুরা যদি আবার একটা যুদ্ধ শুরু করে আমাদের বিরুদ্ধে তাহলে এ ইস্পাত তার শক্তি দেখাবে শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়ে।"

ভারতবর্ষের মানুষ, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সোভিয়েট সাধারণের জ্ঞান দেখলে অবাক হতে হয়। তথাকথিত "পশ্চিমী গণতন্ত্র"-গুলোতে ভারতবর্ষ আজও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বানানো যে ফকির সেই ফকিরই রয়ে গেছে। অথচ সোভিয়েটে এমন লোক কম যে রবীন্দ্রনাথকে জানে না, জানেনা আমাদের অগণিত জঙ্গী মানুষের জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা। চোখে মোটা চশমা, ভাবুক লোকটি রুশ ভাষায় কালিদাস থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন। হেসে বললেন, "অদ্ভুত ভালবাসি তোমাদের দেশের কবিদের।" সোভিয়েটে কালিদাস সামন্ততান্ত্রিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে একজন বলে গণ্য। এরা ইস্কুলে কালিদাস পড়ে। আর আমরা আজও শুধ্ ক্লাইভের "মহত্ত্ব কথা" পড়ে আকুল হচ্ছি। "স্বাধীন" ভারতে কালিদাসের জায়গা কোথায়?

চীন থেকে ফেরার পথে একদিন গিয়েছিলাম স্তালিনের জন্মদিনের উপহার প্রদর্শনী দেখতে। সারা দুনিয়া থেকে উপহার এসেছে—দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের স্তালিনের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন। বিরাট হলঘরগুলো ভরে আছে অসংখ্য উপহারে। প্রতিটি উপহারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু কাহিনী—লক্ষ লক্ষ জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা আর ভালবাসার কথা।

প্রদর্শনীর একটি ঘরের মাঝখানে একটি ঝকঝকে কাঁচের আলমারীতে সযত্নে রাখা ছোট্ট কালো একটা বাক্স। খোলা ডালার ভেতর চোখে পড়ে শুকনো লাল একটা গোলাপ ফুল। একটি অতি দরিদ্র ইরাণী মা অচেনা কোন গ্রাম থেকে বাক্সটি পাঠিয়ে স্তালিনকে লিখেছেন, "আমার শেষ সম্বল তোমাকে পাঠালাম—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে।" বাক্সটির ইতিহাস বলতে বলতে ঘরের ভারপ্রাপ্তা মেয়েটির দুচোখ জলে ভরে এল। ধরা গলায় বললেন, "গরীব ইরাণী মা—তবু

তো সে দেখেনি সোভিয়েটে স্তালিন কী জীবন এনে দিয়েছেন আমাদের। ভেবে অবাক হই—তার শেষ সম্বল সে পাঠিয়ে দিয়েছে।" এক বৃদ্ধা ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। ভিড়ের মধ্যে থেকে অনেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—ঔপনিবেশিক দেশের মানুষের প্রতি বন্ধু সোভিয়েট সাধারণের প্রসারিত হাত।

মস্কোয় থাকতে একদিন নিমন্ত্রণ এল বিশ্ববিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের কর্তাদের কাছ থেকে। আসামের চা বাগানে বাঙালী ও আসামী মজুরদের জীবন সম্বন্ধে এক নাটক অভিনয় করবার এঁদের পরিকল্পনা। নাটক লিখছেন 'প্রাভদার' বিখ্যাত সংবাদদাতা ওল্‌গা চেচট্‌কিনা (ইণ্ডিয়া উইদাউট ওয়াণ্ডার্স্‌-এর লেখিকা) ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাই ব্যগ্র হয়ে খুঁজছেন ঐ অঞ্চলের কাউকে, যাঁর সঙ্গে নাটকটি আলোচনা করা চলবে। জিজ্ঞেস করলাম, "এ বইয়ের উদ্দেশ্য ?" উত্তরে থিয়েটারের বলশেভিক পার্টি কমিটির সম্পাদক বললেন, "আমাদের সোভিয়েট থিয়েটারের উদ্দেশ্য জনসাধারণের কাছে আমাদের দেশের ও অন্যান্য সকল দেশের মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখানো। বাংলা আসামের মজুরদের জীবন, তাদের সংগ্রাম আমাদের আর্ট সৃষ্টির লড়াইয়ের একটা বিশেষ অংশ। তাই নয় কি ?" সোভিয়েটে ভারতীয় দর্শন, ভাষা, সাহিত্য নিয়ে বহু ছাত্রছাত্রী গবেষণা করে। এমন কি এইসব ছাত্রছাত্রী আর অধ্যাপকরা মিলে ভারতীয় ভাষায় আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদির আয়োজন করে, সোভিয়েট সাধারণকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যে।

ওল্‌গাকে বললাম, "ওল্‌গা, তোমাদের দেশ মহান বটে। রোবসন যা বলেছেন খুব সত্যি। একমাত্র এ দেশেই মানুষ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলতে পারে—আমি মানুষ।" উত্তরে ওল্‌গা বললে, "খুব সত্যি। এক অক্টোবর বিপ্লব আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রতিভার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আমি যুদ্ধের সময় আমার দেশবাসীকে দেখেছি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। শান্তির সময় দেখেছি তাদের গড়তে। তারা দুক্ষেত্রেই তাদের মহত্ত্ব প্রমাণ করেছে।—হ্যাঁ আমাদের দেশ আমাদের গর্ব।"

বাঁশী বেজে গেছে। আমরা সোভিয়েট সীমানা ছেড়ে চীনের দিকে এগুচ্ছি। গজেন্দ্র গতিতে, ঢিলে ঢালা ভাবে গাড়ী সীমানা অতিক্রম করছে—যেন আমাদের ব্যস্ততা বুঝে, ইচ্ছে ক'রে। জানলায় জানলায় ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে—"চীন, চীন, চীন", "ঐ ঐ গ্যাখ গ্যাখ।" বরফ জমা জানলার কাঁচের খানিকটা পরিষ্কার করে তাকিয়ে দেখি—দূরে ইস্টিশান—মাঞ্চুরি। দেখা যাচ্ছে এক ঝলক লাল—চীনের নতুন ঝাণ্ডা উড়ছে—লালের মাঝখানে সোনালী পাঁচটা তারায় বিকেলের রোদ্দুর এসে পড়েছে। ঝাণ্ডার নীচে অসংখ্য লোক। ব্যাণ্ড বেজে উঠল গাড়ী স্টেশনে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে। অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে ওরা, বিদেশী অতিথিদের। মেয়েদের হাতে ফুল। বাচ্ছারা ছোট ছোট নিশান ওড়াচ্ছে।

গাড়ী থামতে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এল উদ্দীপ্ত গলায় গান। ওরা গাইছে :

'একতা শক্তি। এই শক্তি লোহা।
এই শক্তি ইস্পাত
লোহার চেয়ে দৃঢ়
ইস্পাতের চেয়ে শক্ত—
গুঁড়িয়ে দেয় সব
অগণতান্ত্রিক প্রথা
সূর্যের দিকে পাঠায়
এক সীমাহীন আলো
—মুক্তি আর নতুন চীন।

গানে গল্পে আদরে আপ্যায়নে ঘণ্টাখানেক এখানে কাটিয়ে পাড়ি দিলাম পিকিং অভিমুখে। তারপর পিকিং-এর পথে অল্পে অল্পে মুক্তি কথাটার মানে নতুন করে বুঝলাম। প্রতি স্টেশনে কাতারে কাতারে ছেলে বুড়ো আর মেয়ের ভিড়—দূর দূর গ্রাম থেকে দলে দলে আসছে হরেক রকম উপহার নিয়ে—বিদেশী বন্ধুদের জন্যে। ঔপনিবেশিক দেশের মানুষ মাত্রেই জানে এ হাসি, এ আনন্দ, এ কূল ছাপানো বন্ধুত্ব এক সত্যিকারের স্বাধীন দেশের মানুষের পক্ষেই ব্যক্ত করা

সম্ভব। এরা প্রাণ দিয়ে জেনেছে সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততন্ত্রবাদের বিভীষিকা, তার বিরুদ্ধে লড়ে জয়ী হয়েছে বলেই দূর দূর গাঁ থেকে দিনরাতের ঠিকানা না রেখে আসতে পারে তিনটি ঔপনিবেশিক দেশের মেয়েকে আশার ছবি এনে দিতে। নিজেরা যা পেয়েছে তা ভাগ করে দিতে চায়—দুনিয়ার গরীবদের কাছে মুক্তির প্রকৃত ছবি পৌঁছে দিতে চায়। এইসব চাষী মেয়েপুরুষদের কর্মকঠোর হাতে হাত মিলিয়ে নিজেকে সেদিন ধন্য মনে হয়েছে।

মনে পড়ে ছোট্ট ওন-ওন-সি স্টেশন। ফুলের মত একদল বাচ্চা রুমাল নেড়ে নেড়ে "ইয়াঙ্কো" নাচ নাচছে। বিরাট খঞ্জনী বাজিয়ে তাল দিচ্ছে একদল ছেলেমেয়ে। মিষ্টি, ফুল, মুড়ি আর বাদামের চাক এনেছে—বাচ্ছাদের মায়েরা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এসেছেন। মেয়েরা হাত ধরে বলছে—"মাও টুসি (সভাপতি মাও) আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। তোমাদের দেশেও এমন হবে।" দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাচ্ছারা কারা ?" উত্তরে বললে, "এদের বাপ মা আগে ছিল জমিহীন চাষী, জমিদারের দাস। ইয়াঙ্কো নাচা দূরের কথা, এ বাচ্ছারা আগে অনেকেই ভিক্ষে করে খেত। মুক্তির পরে এদের বাপ মায়েরা জমি পেয়েছে। নিজেদের ফসল আজ তারা নিজেরা ঘরে তোলে। বাচ্ছারা শুধু আজ ইস্কুল যায় তাই নয়—এরা নাচে, গায়, খেলা করে। এদের শৈশব আজ মুক্তি পেয়েছে।"

অনেক রাতে গাড়ী পৌছল চাও-ডাং-এ। ছোট্ট এক টুকরো স্টেশন। কিন্তু অগুন্তি মানুষ। অভ্যর্থনা জানাতে মাঞ্চুরিয়ার শীতকে তারা গ্রাহ্য করেনি। তাদের হাসিভরা মুখ, ঝাণ্ডা আর আলোর এক অদ্ভুত আকর্ষণ। লাফিয়ে নেমে পড়লাম সকলে ব্যগ্র জনতার মাঝখানে। আওয়াজ উঠল, "আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব জিন্দাবাদ", "স্বাধীন চীন জিন্দাবাদ", "চীন-ভারত ভাই ভাই" ইত্যাদি।

ভীড় ঠেলে এক বৃদ্ধা এগিয়ে এলেন। চাষী মা। মুখে অতীত জীবনের দুঃখ কষ্টের ছাপ সুস্পষ্ট। ছুটে এসে বুকে চেপে ধরলেন আমাকে। দুচোখ বেয়ে তাঁর পড়তে লাগল জল। সস্নেহে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে নরম গলায় অস্পষ্ট

অচেনা ভাষায় কী যেন বললেন। তাঁর ভাষা বুঝিনি। জানিনা কেন তিনি আকুল হয়ে কাঁদছিলেন। তবু সে মুহূর্তে এক হয়ে গিয়েছিল আমাদের প্রাণের স্পন্দন—চীন আর ভারতবর্ষের মুক্তিকামী দুটি প্রাণ।

সেদিন রাতে পিকিংগামী চলন্ত ট্রেনের কামরা থেকে সেই জনতার দিকে তাকিয়ে তীব্রভাবে অনুভব করেছি সেই অচেনা মায়ের ভালবাসা। ঐ চীনা মায়ের প্রাণের স্পন্দনের সঙ্গে মিলিত আমার প্রাণ সেদিন বিশ্বের ও আমার দেশের আসন্ন মুক্তির উপলব্ধিতে ভরে দিয়েছিল আমার সমস্ত চেতনা।

পিকিঙের মুক্তদ্বার

ঝিরঝিরে সাদা বরফ-বৃষ্টি আমাদের চীনের প্রাচীন রাজধানীতে পৌঁছনকে অভ্যর্থনা জানাল। শীত বেশ। তবু শহরের যেন শীতবোধ নেই। সেদিন চারিদিকে একটা উৎসবের ভাব। মোড়ে মোড়ে লাল শালুর ওপর সাদা অক্ষরে চীনে ভাষায় নানারকম আওয়াজ লেখা—"শান্তির জন্যে গড়ো", "বিদেশী অতিথিদের স্বাগতম্", "সভাপতি মাও দীর্ঘজীবী হোন" ইত্যাদি।

পিকিং আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। পিকিং—যে এই সেদিনও ছিল সামন্তরাজা, চোরাকারবারী আর বিদেশী দালালদের। কিন্তু আজ পিকিং মুক্ত। সে আজ জনসাধারণের শহর। এই অতি স্বাভাবিক ঘটনাটি পিকিংকে আশ্চর্য রকমের সুন্দর করে তুলেছে। পিকিং-এর দ্বার তাই আজ পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী জনসাধারণের কাছে মুক্ত। প্রাচীন পিকিং আজ নতুনের আগমনে তাই অপূর্ব সুন্দর।

পিকিং সুন্দর শহর। তার সতেরটি সিংহদ্বার সোনালী, নীল আর সবুজ রঙের কারুকার্যে ঝলমল করছে। প্রাসাদ, দেবালয় আর প্যাগোডার পোর্সলেনের টালি দেওয়া ছাদ অনেক দূর থেকে নজরে পড়ে। ওপর দিকে পাকানো শুঁড় বার করা ছাদের কোণগুলো নীল আকাশের গায়ে অদ্ভুতভাবে এঁটে আছে যেন। প্রাসাদের চারিধারে নীল সরোবর আর বিস্তৃত বাগান। মাথা নোয়ানো এক গাছের ধারে কোথাও বা ভাসছে দেখা যায় সোনালী ড্রাগনের মত এক নৌকো। সেকালে রাজপুত্তুররা সখ করে বেড়াতে যেতেন। প্রাসাদের আঁকা বাঁকা পথগুলো সত্যি 'চীনে ধাঁধাঁ'। একবার ঢুকলে যেন আর বেরুবার আশা থাকে না। পিকিং-এর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আশ মেটেনা। শ্রদ্ধায় মন ভ'রে ওঠে; সেই সব অগণিত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, যাঁরা জীবনের সমস্ত কিছু

দিয়ে পিকিংকে গড়েছিলেন কিন্তু সম্মান পান নি। আজ তাঁদের কথা দরদ দিয়ে মানুষ প্রথম ভাবছে, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

পিকিং সুন্দর ; কিন্তু তার বুকে আজও তিনশ' বছরের বিদেশী দুঃশাসনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। একদিকে যেমন তার সৌন্দর্য আর কারুকার্যের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে তেমনি কুৎসিত ভাঙা বস্তী—যেন মুখ গুঁজড়ে দলে দলে ভিখিরী বসে আছে। এদিক দিয়ে পিকিং সত্যি কলকাতার মত। শুধু পিকিং-এ বিদেশী শাসনের এই ক্ষতগুলোকে মুছে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে চীনের গণতান্ত্রিক সরকার, আর কলকাতায় দারিদ্র্য আর ক্ষত শুধু বিষিয়েই উঠছে। জনসাধারণ যতই গৃহহারা হচ্ছে, ততই বড় বড় প্রাসাদ উঠছে চোরাকারবারীদের। আর যারা নিঃশব্দে সেই প্রাসাদ গড়ে চলেছে, সেইসব অগণিত মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নতুন দিনের—যেমনভাবে অপেক্ষা করেছিল পুরনো চীনের মানুষ।

পিকিং-এর যে এলাকা জুড়ে তার প্রাসাদ, সরোবর, বাগান ইত্যাদি—সেই পুরো এলাকাটা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে চীনের সম্রাট্‌রা এর নাম দিয়েছিলেন "নিষিদ্ধ নগর" ; অর্থাৎ, এর সমস্ত সুখসুবিধা থেকে সাধারণ পিকিংবাসী বঞ্চিত। "নিষিদ্ধ নগরের" মূল সিংহদ্বার "তিয়েন আন্ মেন্" (স্বর্গীয় শান্তির দ্বার) সেকালে ছিল অশান্তির প্রতীক। মানুষকে শাস্তি দিতে নিয়ে যেত সেই সিংহদ্বার দিয়ে। আজ সে দ্বার শুধু যে চিরদিনের মত উন্মুক্ত তাই নয়, ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিন লক্ষ মানুষ এই সিংহদ্বারেরই ঠিক ভেতরে ব'সে পিকিংকে চীনের রাজধানী করবার অঙ্গীকার করেছিল।

আজ তিয়েন আন্ মেন্ সত্যিই শান্তির দ্বার। তার সামনের পথে কিশোরদের "ইয়াঙ্কো" নাচের শব্দ আর উচ্ছ্বসিত মিছিলগুলোর আওয়াজ দুনিয়াময় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্তকারীদের প্রাণে আতঙ্ক এনে দেয়।

আমাদের চীনে বন্ধুদের সঙ্গে পিকিং-এর পথে পথে ঘুরতাম আর শুনতাম সেই শহরের জীবনকাহিনী। শহরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার ইতিহাস।

পিকিং-এর সিংহাসনের প্রশস্ত গদীতে শেষ মাঞ্চু এক পেটোয়া সম্রাজ্ঞী। তার রাজ্য চল্‌ত তলোয়ারের জোরে আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে নীতিহীন চুক্তি করে। এ-সম্রাজ্ঞীর অত্যাচারের কথা আজও চীনের ঘরে ঘরে লোকে মনে করে রেখেছে। এ শতাব্দীর গোড়ায়—চীনে তখন মানুষ দিন দিন ভিখিরী হয়ে যাচ্ছে—সম্রাজ্ঞী হুকুম দিলেন: "নৌ-বাহিনী বানাবো। ট্যাক্স দাও।" যথা আজ্ঞা তথা কাজ। ঘরে ঘরে হাহাকার উঠলো। কিন্তু ট্যাক্স দিতে হল। পথে বসলো অনেকে। কত গৃহহীন মায়ের বুকের শিশু শীতে জমে মরে গেল। তবু ট্যাক্স দিতে হল সকলকে। লক্ষ লক্ষ টাকা জমা হল রাজকোষে। তারপর দেখা গেল সেই টাকায় পিকিং থেকে অল্প দূরে পাহাড়ের গায়ে সম্রাজ্ঞীর গ্রীষ্মের প্রমোদ-প্রাসাদ উঠছে। প্রাসাদের চারপাশে গাঢ় নীল সরোবর। গ্রীষ্মে পদ্ম ফোটে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শিশুর রক্তে ভেজা সেই পদ্ম। এই প্রাসাদের এক অপূর্ব সুন্দর ঘরে দাঁড়িয়ে এক চীনা বন্ধুর কাছে এই ইতিহাস শুনছিলাম। তিনি বৃত্তান্ত শেষ ক'রে বললেন, "যারা এ প্রাসাদ গড়েছিল, তারা হয়তো নিজের হাতের কারুকার্যকে নিজে ঘৃণা করেছে। হয়তো তাদের কেউই জানত না যে মাত্র ষাট বছর পরে এই প্রাসাদ হবে তাদেরই বংশধরদের।"

মেয়েদের অধিকার নিয়ে কথা উঠল। "দুনিয়ায় পুরনো চীনের চেয়ে কম অধিকার নিয়ে কোন দেশের মেয়ে থাকত বলে শুনিনি"—এক চীনা বন্ধু বললেন, "আজ আবার এক সোভিয়েট ও পূর্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া নয়া চীনের চেয়ে স্বাধীন মেয়ে কোন দেশে আছে ব'লে জানি না।"

"নিষিদ্ধ নগর" ঘুরে দেখতে দেখতে আর এক কাহিনী শুনলাম। এক যুবক সম্রাট এ সময় পিকিং-এর গদীতে বসে যথেচ্ছাচার করত। তিন হাজার রক্ষিতা (এর কম হলে নাকি চীনা সম্রাটদের সম্মান থাকত না। হায়দ্রাবাদের নিজামের জাত-ভাই আর কি!) পরিবেষ্টিত হয়ে সম্রাট প্রায়ই বাগানে বেড়াত। সঙ্গে থাকত সব চেয়ে প্রিয় রক্ষিতাটি। সম্রাট মাঝে মাঝে তার রক্ষিতাদের জব্দ করার জন্যে তাড়া দিত—দেখত ছোট ছোট বাঁধা পায়ে হোঁচট খেয়ে পড়লে তাদের কেমন লাগে। পুরনো চীনে মেয়েদের ছ'বছর বয়স থেকে পায়ের সব আঙুল ভেঙে বেঁধে

রাখত। সামন্তরাজাদের এই ছিল সৌন্দর্যবোধ। মেয়েরা যত পঙ্গু আর আড়ষ্ট হবে, ততই নাকি তাদের সুন্দর দেখাবে!

একদিন সম্রাটের মন বড় খারাপ। জীবনে নাকি মাধুর্য নেই। তার প্রিয় রক্ষিতাকে জিজ্ঞেস করল মনে ফুর্তি আনার জন্যে কী করা যায়। অনেক ভেবে দুজনে হঠাৎ এক অভূতপূর্ব খেলা বার করল। সম্রাট প্রহরীকে বলল, "শহরের মেয়েদের সব ধরে আনো—যাদের খুব ছোট ছোট পা তেমনি মেয়েদের। আমরা ওদের পা কেটে তার পাহাড় বানাবো।" শুরু হল তাণ্ডব। শহর থেকে দলে দলে মেয়ে ধরে আনে আর বেছে বেছে খুব ছোট পা যাদের, তাদের কেটে ফেলতে হুকুম করে সম্রাট। আর্তনাদে ভরে ওঠে চারিদিক। অবশেষে বেশ বড়সড় এক পাহাড় তৈরী হল বাগানে—সম্রাট আহ্লাদে আটখানা। হেসে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে তার প্রিয় রক্ষিতা। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে এল সম্রাটের মুখ, বলে উঠল—"না, কিছুতে মন উঠছে না।" ভাবল, তারপর হঠাৎ বলল, "পাহাড়টা বেমানান কোথায় জানো? ওর চুড়ো করা দরকার—খুব মিষ্টি ছোট্ট একজোড়া পা দিয়ে।" বলে হাঁকল, "জল্লাদ, কাটো এর পা জোড়া—আমার পাহাড়ের চুড়ো চাই।" এমনি অমানুষিক অত্যাচার হ'ত চীনের মেয়েদের ওপর—যেমন আজও চলে আমাদের দেশে। হয়ত ধরণে তফাৎ আছে কিন্তু মূলতঃ, আজও আমাদের মেয়েরা নির্যাতিত।

চীন সাম্রাজ্য ক্রমশ ক্ষয়ে এল। ১৯৩৭ সালে এল জাপানী বর্বররা। রাজাদের আমলে তলোয়ারের আঘাতে মরত মানুষ, এখন এল বন্দুকের যুগ। চীনা জনসাধারণের এ শত্রু খুবই সাংঘাতিক, খুবই সংগঠিত। তবু লড়াই করে হটাল তাকে, মেয়ে পুরুষে সমানে লড়ে। জল, বরফ, রোদ, পাহাড়, ঝড়—কিছুই রুখতে পারল না চীনের মানুষের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়াকে। জাপানীরা হারলে আবার কায়েম হল মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল সরকার। বিশ্বাসঘাতকতা করে চিয়াং কাই-শেক জাঁকিয়ে বসল গদীতে। শহীদের রক্তে পিকিং-এর রাস্তা ভেসে গেল। পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক সে সময়ের ইতিহাস বলছিলেন: "৯ই ডিসেম্বরে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী আর অন্যান্য পিকিংবাসীর ডাকে সমস্ত

দেশ জাপানীদের বিরুদ্ধে জেগে উঠল। শুধু কুয়োমিণ্টাং গড়িমসি করতে লাগল। তারপর গোটা দেশের ও বাইরের চাপে যখন জাপানীরা পরাজিত হল—তখন চিয়াং-এর প্রথম লক্ষ্য হলাম আমরা। চীনের সব চেয়ে প্রিয় শহর পিকিং—শুধু এ জন্যে নয় যে এক হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এজন্যেও যে পিকিং-এর বুক থেকে বিপ্লবের ঢেউ উঠে সারা চীনে ছড়িয়ে পড়েছে। এই জন্যেই পিকিংকে আমরা আমাদের রাজধানী করেছি।"

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে চীনের মুক্তি-ফৌজ পিকিংকে মুক্ত করে। সেই থেকে আজ অবধি বহু নতুনত্বে পিকিং-এর পুরনো চেহারা বদলে গেছে। পিকিং-এর ভেতরকার চেহারার পরিষ্কার বদল অনায়াসে যেকোন বিদেশীর চোখে পড়বে। বিপ্লবের বছর খানেক পরে। আমরা তখন পিকিঙে। একদিন বাজারে গিয়ে দেখি সমস্ত দোকানে লেখা আছে: "দাম করবেন না। ইউনিয়নের নির্দেশমত আমরা সমস্ত জিনিষের দাম বেঁধেছি।" কিছুদিন আগেও পিকিং-এর লোক কল্পনা করতে পারেনি যে এমন ভাবে এ-বাজারে সমস্ত জিনিষের দাম বাঁধা সম্ভব হবে। আর চিয়াং-এর যুগে তারা একথাও আশা করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল যে, তারা কখনও মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে পারবে। একটা ডিম কিনতে মানুষের বেশ কয়েক হাজার চীনা ডলার দিতে হত। আর নোট বওয়া মানে ছিল মোট বওয়া। মুক্ত চীনে তখন মুদ্রাস্ফীতি পুরোপুরি রোখা যায়নি। তার মূল কারণ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা তাইওয়ান দখল ক'রে এবং কোরিয়ার পথে মাঞ্চুরিয়াকে বার বার আক্রমণ ক'রে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে তীব্রভাবে ব্যাহত করেছে।

আমাদের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিলেন মেট্রোপালটান দেশগুলোর থেকে অনেকে। তাঁরা দারুণ মর্মাহত হলেন চীনে আজও রিক্সা চলেছে দেখে। "কিসের বিপ্লব—যদি রিক্সার মত বর্বর জিনিষকেই না উচ্ছেদ করতে পারো?" তাঁরা উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে শান্ত ধীর স্থির গলায় উত্তর দিলেন আমাদের এক চীনা বন্ধু, "আমরা ইউটোপিয়ায় বিশ্বাস করি না। নীতিকে গোঁড়ামি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় বলেও আমরা মানি না। রিক্সা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জঘন্য জিনিষ। সমাজের বুক থেকে তাকে যত শিগগির মুছে ফেলা যায়

ততই মঙ্গল। এ-কথা আমরা সকলে বুঝি। সাংহাই-এর একটা অভিজ্ঞতা বলি। মুক্তির পরে আমাদের সাংহাই-এর সংগঠকরা অন্য কিছু করবার আগে রিক্সা বে-আইনী করে দিলেন। প্রথম দিন রিক্সা চালকেরা বেশ ফূর্তিতে কাটাল। দ্বিতীয় দিনে এল অন্ন-চিন্তা। হাজার হাজার নতুন বেকার চিয়াং-এর সময়ের তৈরী বিরাট বেকার-বাহিনীকে আরও বড় করে তুলল। আমরা বুঝলাম রিক্সাকে তুলতে হলে প্রথম আমাদের সেই মজুরদের কাজের বন্দোবস্ত করতে হবে। নয়তো আমরা হাজার হাজার মজুর ও তাঁদের পরিবারের অনাহারের কারণ হবো। আমরা তাই আগে বেকার-সমস্যাকে পুরোপুরি উচ্ছেদ করবার পরিকল্পনা নিয়েছি।"

নভেম্বর মাসের এক ঠাণ্ডা বিকেলে পিকিং-এ হৈ চৈ পড়ে গেল। সারা শহর জুড়ে খবর বেরিয়েছে—পিকিং-এর বুক থেকে সমস্ত বেশ্যালয় তুলে দেবার অভিযান শুরু হয়েছে। বিকেল চারটে নাগাদ আইন পাশ হল। পাঁচটার মধ্যে সমস্ত বেশ্যাপল্লী ঘিরে ফেলল মুক্তি-ফৌজ, মহিলা-সংগঠক, ডাক্তার, যুব-সংগঠকরা। প্রায় আড়াই হাজার কর্মীকে এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তিন হাজার বছরের এই অভিশাপকে দেশের বুক থেকে মুছে ফেলতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সহজেই কল্পনা করা যায়। যে ঘৃণ্য ব্যবস্থা না থাকলে কোন সামন্ততান্ত্রিক বা বুর্জোয়া রাজত্বের কাজই ভালভাবে চালান সম্ভব হয়নি শাসকদের, সেই ব্যবস্থাকে সমূলে উপড়ে ফেলবার এই সাহসী অভিযানকে সেদিন আমরা—বিশেষ করে মেয়েরা—আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছি। চীনের মেয়েরা সমাজে সমান অধিকার পেয়েছে তার আর একটি প্রমাণ: বেশ্যাবৃত্তির অবসান—ঘৃণ্য জীবন থেকে মেয়েদের মুক্তি।

দু'মাসে দুশো সাঁইত্রিশটি বেশ্যালয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গেল। বেশ্যাদের হিসেব নিয়ে দেখা গেল তারা বেশীর ভাগই ক্ষিদের জ্বালায় এ জঘন্য ব্যবসায় কবলে পড়েছিল। বাদবাকি এসেছিল সামাজিক নিপীড়নের চাপে। আইন পাশ হবার পর প্রথম চিকিৎসা চলল। তারপর শিক্ষা। অনেক ধৈর্য, অনেক শক্তি আর সুবুদ্ধি দিয়ে এদের বশে আনা সম্ভব হয়েছিল। এদের সবাইকে নতুন নাম দেওয়া হল—

"ছাত্রী।" নতুন সমাজের তারা ছাত্রী। তাদের শিক্ষালয়ের নাম দেওয়া হল, "নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান।" গোড়া থেকেই কড়া চোখ রাখা হল সেইসব বেশ্যার দালাল ও মালিকদের ওপর, যারা এই সমস্ত অসহায় মেয়েদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। তাদের বন্দী করে রাখা হল ; গণ-আদালতে তাদের বিচার হবে।

এর আড়াই মাস পরে একদিন চীনা গণতান্ত্রিক মহিলা প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ও সরকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই মেয়েদের অবস্থা দেখতে যাবার ডাক এল। ইতিমধ্যে আটাশ জন মেয়ে পুনর্বাসিত হয়েছে (কারুর বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ বা নিজেদের পরিবারে ফিরে গেছে)। দু'মাস আগে প্রায় সকলেই ছিল নিরক্ষর। আজ তারা সকলেই লিখতে পড়তে শিখেছে। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই অদ্ভুত পরিবেশে। বেশীর ভাগ মেয়ের বয়সই পঁচিশের নিচে। তাদের মধ্যে আমূল পরিবর্তনের সুস্পষ্ট আভাস। আমার কাছ থেকে তারা ভারতবর্ষের মেয়েদের কথা শুনতে চাইল। আমি বললাম, "আমরা আজও পরাধীন। আজও ক্ষিদের জ্বালায় আমাদের মা-বোনেরা এ পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়—তাদের শিশুর মুখ চেয়ে তারা মরতেও পারে না"—আমি এই অবধি বলতেই কলরব করে মেয়েরা বলে উঠল—"মাও টুসি (সভাপতি মাও) কে ব'লো—সব ঠিক করে দেবেন। আমাদেরও তো অমনি অবস্থা ছিল।" তারপর তারা গান গেয়ে শোনাল—স্বাধীন জীবনের গান।

ওরা নাটক অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেছিল আমাদের জন্যে। বড় হলঘর। আগে কুয়োমিণ্টাং অফিসাররা এখানে মদ খেত আর নাচ দেখত। "তারা আজ তাইওয়ানে, তারপর নিউ ইয়র্ক যাবে বোধহয় ট্রুম্যানের অতিথি হয়ে থাকতে"—হাসতে হাসতে একজন বললেন। যে নাটকটি অভিনয় করল ওরা, সেটা ওদের নিজেদেরই লেখা। নাটকে সূক্ষ্মতা নেই। মোটা বাস্তব জীবন মোটা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা। অদ্ভুত ভাল অভিনয় করল তারা—তাদের জীবন কী ছিল আর কী হতে চলেছে এই ছিল মোটকথা। ঘরে প্রত্যেকেরই মন ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। অভিনয় শেষ হলে একটু বয়স্থা একটি মেয়ে এল।

হেসে বলল, "কিছু মনে করবেন না। গলা ভেঙ্গে গেছে। গতকাল মিটিং-এ দালাল আর মালিকদের বিরুদ্ধে বহুক্ষণ অভিযোগ করেছি তাই গলা ভেঙে গেছে। আগে সব মেনে নিতাম। আজ নতুন দিনে নতুন কথা বলতে শিখেছি আমরা। তাই গলা ভেঙে যাচ্ছে।" ব'লে সে মুক্তি সম্বন্ধে একটা গান করল।

ভিখিরীদের সম্বন্ধেও প্রায় এই ধরণের নীতি নেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রথম ঘিরে ফেলা হল; অর্থাৎ, শহরের সমস্ত জায়গা থেকে তাদের তুলে এনে এক জায়গায় জড়ো করা হল। অতি বৃদ্ধ আর পঙ্গুদের পাঠান হল সরকারী সদনে। জোয়ান মেয়েপুরুষরা কেউ বা পেল জমি (যারা চাষ করতে রাজী), কেউ বা কারখানায় কাজ। কিশোর বয়সীরা গেল কাজ শিখবার স্কুলে আর নেহাৎ শিশুরা সরকারী স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল।

যে আড়াই মাস পিকিং-এ ছিলাম, প্রতিদিন বদল দেখেছি—প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া কাকে বলে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাহলে সত্যি এমন হবে আমাদের দেশেও!

পিকিং আজ মুক্ত। তার খোলা দ্বার দিয়ে পৃথিবীর মানুষ এই প্রথম প্রকৃত চীনকে দেখবার সুযোগ পাচ্ছে। আজ পিকিং-এর চিরমুক্ত তিয়েন আন্ মেন্ পেরিয়ে হাজার হাজার মানুষ "নিষিদ্ধ নগর"কে জয় করেছে। তিয়েন আন্ মেনের আজ নতুন নাম হয়েছে "মুক্তির সিংহদ্বার"। সে দ্বারের ডান ধারে সভাপতি মাও-এর এক বিরাট ছবি সহাস্যে চেয়ে আছে—পঞ্চাশ কোটি মানুষের কর্মকঠোর হাতের দিকে।

"বন্ধুগণ!" মাও ডেকে তাদের বলেছিলেন, "আমাদের বিপ্লব আমাদের মাত্র দশ হাজার লি-র অভিযানের প্রথম ধাপে এনে ফেলেছে। আমাদের সামনে বিরাট দায়িত্ব। তা পালন করতে হবে।"

ভোর পাঁচটা। পিকিং-এর চোখে ঘুম নেই। মুক্তির সিংহদ্বারের তলা দিয়ে গাঁইতি, শাবল, হাতুড়ির ছন্দে ছন্দে মেলানো গান গাইতে গাইতে চলেছে অসংখ্য মানুষ। তারা যুবক কী বৃদ্ধ, মেয়ে কী বাচ্ছা—অন্ধকারে বোঝা যায় না। শুধু

একটা সুর ওঠে। মনে হয় ওরা দশ হাজার লি-র অভিযানে চলতে চলতে জাগাবার গান গাইছে :

আকাশ লাল ক'রে ওঠে সূর্য।

কি অসম্ভব সুন্দর এই পিকিং !

শুনতে শুনতে মনে পড়ে গেল বিপ্লবের অনেক আগে লেখা কবি আই চিং-এর কয়েকটি লাইন :

"আর এখন ঠিক এই মুহূর্তে
হে বিষণ্ণ কবি,
তোমার জরাজীর্ণ দুঃখ দূরে সরিয়ে দাও :
তোমার যে হৃদয় এতদিন কেবলি প'ড়ে প'ড়ে
মার খেয়েছে
তাকে আশায় তুলে ধরো।
আমাদের এই সুন্দর দেশে, তাকাও—
উজ্জ্বল আকাশের নিচে, দেখ—
মাথা তুলছে জীবন।
দুঃখ আর জ্বালা যন্ত্রণা আজ
দুরবহ স্মৃতিমাত্র।"

ভূমি-সংস্কার

যদি উত্তরে বরফে ঢাকা মাঞ্চুরিয়া থেকে যাত্রা শুরু করা যায়, পূবে পড়বে নীল সমুদ্র, তার কিনারায় বড় বড় শহর—হারবিন, মুকডেন, সাংহাই ; দক্ষিণে পড়বে ক্যান্টন্ এবং অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান জায়গাগুলো। তারপর পশ্চিমে যাবার আগে থম্‌কে দাঁড়াতে হবে এক বিরাট মূর্তির সামনে—হিমালয়। দিগ্‌দিগন্তব্যাপী দুই মহাদেশের মাঝখানে বসে যুগ যুগ ধরে এই বয়োবৃদ্ধ পাহাড় যেন গৌতম বুদ্ধের মত মৈত্রী আর শান্তির তপস্যা করছে।

চীনের যে সমস্ত সমস্যা সম্বন্ধে আমার জানবার বিশেষ আগ্রহ ছিল, তার মধ্যে ভূমি-সংস্কার হ'ল প্রধানতম। তাই চীনে পৌঁছেই এ সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করেছি। ভূমি-সংস্কারের ইতিহাস একটা প্রবন্ধে লিখে শেষ করা যায় না। একটা বইও তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এ নিয়ে মহাকাব্য রচনা করা চলে। সাম্যবাদ কায়েমের লড়াইয়ে চীনের ভূমি-সংস্কারের ইতিহাস যে বনিয়াদ তৈরী করেছে, তাকে টলায় এমন শক্তি দুনিয়ায় কারও নেই।

যেদিন আমার প্রথম এই ভূমি-সংস্কারের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হ'ল, সেদিন জানুয়ারীর এক ভীষণ ঠাণ্ডা সকাল। ভোর থাকতে আধা-ঘুমন্ত পিকিং-কে পেছনে ফেলে চলেছি। গাড়ীর দুরন্ত গতি। অনেকটা পথ। তাড়া না করলে দুপুরের মধ্যে পৌঁছনো যাবে না। আর দুপুরের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে "স্বাধীনতার ফল ভাগ" অর্থাৎ জমিদারের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির বাঁটোয়ারা দেখতে পাওয়া যাবে না। পায়ে লোমের জুতো, হাতে গরম চামড়ার দস্তানা, মাথায় গরম রুমাল, গায় বালাপোষের নীল চীনা ইউনিফর্ম পরে ঠাণ্ডার সঙ্গে যুঝতে গিয়ে আমার এক অভিনব চেহারা হয়েছে। কিন্তু তবু হাড়ের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কাঁপুনি লাগা আর পায়ের বুড়ো আঙুল নীল হয়ে যাওয়া রুখতে পারছি না। গাড়ীর ফাঁক দিয়ে

ছুরির ফলার মত হাওয়া চোখে লাগছে। ভয় হচ্ছে চোখের জল জমে বুঝি বা বরফ হয়ে যায়।

আমার সঙ্গে আছেন ফোং থাই জেলার (যে এলাকায় ভূমি-সংস্কার দেখতে চলেছি) তুখোড় চাষী সংগঠকরা। আজীবন তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন আজ সফলতার পথে। সমস্ত এশিয়ার নিপীড়িত চাষী সমাজ এক টুকরো জমি পাবার যে স্বপ্ন দেখেছে, তাকে কার্যকরী করেছেন যাঁরা, তাঁরা মহাচীনের বুক জুড়ে অহরহ খেটে চলেছেন। প্রতি পদক্ষেপে এই সব কাজ-পাগল মানুষগুলোর বুদ্ধি-দীপ্ত মুখের দিকে চোখ পড়ে। বোঝা যায় কিসের বলে চীনে আজ দুর্ভিক্ষ মহামারীকে প্রতিহত করে দুরন্ত গতিতে নতুন জীবন এগিয়ে চলেছে।

হু হু করে এগিয়ে চলেছে গাড়ী। হঠাৎ খারাপ রাস্তা স্বরু হল। আর জোরে যাওয়া চলবে না। আস্তে আস্তে ধুলো উড়িয়ে সাবধানে চলেছি। দুধারে কঙ্কালসার গাছ কালো কালো ডাল বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও বা সামনে মোট বোঝাই গরুর গাড়ীর ওপর জবু স্থবু হয়ে বসে থাকা এক বুড়োর সাদা দাড়ি চোখে পড়ছে। মোটর কাছে এসে পড়ায় হ্যাট্ হ্যাট্ করে পথ করে দিতে গিয়ে গাড়োয়ান ভয়-খাওয়া জানোয়ার দুটোকে সামলাতে অস্থির হচ্ছে। মাঝে মাঝে দূরে আকাশের গায় দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ কোন প্যাগোডা। আশে পাশের জমি ঠাণ্ডায় শুকিয়ে চিড়্ খেয়ে আছে। সাঁই সাঁই করে উত্তুরে হাওয়া যেন দু'হাতে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে আমাদের গাড়ীর দরজাগুলো। বলা বাহুল্য, চাষের কাজ শুরু হয়নি এখনও। তবুও চাষীরা এখানে ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। জমি পরীক্ষা করে দেখছে। নতুন পাওয়া জমিতে ফসল বোনার জন্যে নিস্‌পিস্ করছে তাদের হাত।

ফোং থাই জেলার কৃষক সমিতির সম্পাদক আমাকে পথে যেতে যেতে বিস্তারিত ভাবে ভূমি-সংস্কারের ইতিহাস, তার গুরুত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্য বোঝাচ্ছিলেন। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল চীনের লক্ষ লক্ষ মানুষের

ইতিহাস। যত শুনছিলাম, মানুষের প্রতি, বিশেষ করে চীনের মানুষের প্রতি ভালবাসা আমার আরও গভীর হচ্ছিল।

প্রথম এইটুকু শুনেই মন আশায় ভরে উঠেছিল যে, পৃথিবীর প্রায় তেষট্টি লক্ষ বর্গমাইল আর প্রায় পঞ্চাশ কোটি মানুষ চীন বিপ্লবের ফলে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। আয়তনে সোভিয়েট আরও বড়; যদিও লোকসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে চীনেরই সব চেয়ে বেশী। কাজেই চোখ বুঁজে অনুমান করা যায় আমরা শান্তিকামী মানুষেরা কি প্রচণ্ড শক্তিশালী। এক চীনের লোকসংখ্যাই একজোটে ধনতান্ত্রিক ইউরোপের দ্বিগুণ আর আয়তনে এদের চেয়ে আটত্রিশ লক্ষ বর্গমাইল বেশী। তবু মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের দুরাশা—তারা নাকি চীন আর সোভিয়েটের পায়ে শেকল পরাবে!

এই বিশাল দেশকে দুহাতে লুণ্ঠন করার ইচ্ছে পৃথিবীর সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকেই প্রলুব্ধ করেছে। এদেশের মানুষকে পদানত করবার জন্যে সব রকম কৌশলই শেষ অবধি ব্যর্থ হয়েছে। চীনের শতসহস্র বীরের জীবন জলাঞ্জলি দিয়ে শোষণ চালিয়েছে বিদেশী শাসকরা। এইসব বীরেরা বুকের উত্তাপে বিবর্ণ চীন মায়ের বিশাল স্নেহশীল প্রাণটিকে জীইয়ে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের হিংস্র লোমশ থাবা দিয়ে চীনকে আঁকড়ে থেকেছে কিন্তু মারতে পারেনি। অনাহারে রেখেছে কিন্তু পদানত করতে পারেনি।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন যেমন আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীল করে রাখার ফলে আমরা আমাদের শিল্পোন্নতি করতে পারছি না, যেমন আমাদের কৃষি-উৎপাদনও হু হু করে অধঃপাতে চলেছে, তেমনি ছিল পুরনো চীনে। বিপ্লবের ঠিক আগে ওদের উৎপাদনের মাত্র শতকরা দশ ভাগ ছিল শিল্পজাত। সমস্ত ভূমিব্যবস্থাই ছিল সামন্ততান্ত্রিক। তার ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে দেশ ছেয়ে ছিল। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে চীন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী দেশ।

১৯৪৯ সালে, একটানা দীর্ঘ কঠোর লড়াইয়ের পর চীনে যখন প্রথম গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হ'ল, তখন দেশের অর্থনীতিকে একটা শ্মশানের সঙ্গে তুলনা করলে

বাড়িয়ে বলা হবে না। গণ-সরকার কায়েমের পরও পরিপূর্ণ কোন অর্থনতিক পরিকল্পনা নিয়ে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করার আয়োজন ক'রে উঠতে না পারার প্রধান এবং একমাত্র কারণ—মাঞ্চুরিয়া ও তাইওয়ানে মার্কিণ আক্রমণ। এক হাতে গড়া আর অন্য হাতে সেই সৃষ্টিকে রক্ষা করার এ এক অতুলনীয় সংগ্রাম। তাই শান্তির কপোত বুকে এঁটে নিয়ে চীনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যখন কোরিয়ায় প্রাণ দিতে যায় বেইমান আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিবেশীর ঘর থেকে তাড়িয়ে নিজের সৃষ্টি রক্ষা করতে, তখন আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় যে চীনের সাধারণ মানুষ আজ সত্যি স্বাধীন।

ঘরে বাইরে হাজার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কতকগুলো মূল সমস্যার সমাধান চীন সরকার করেছে। এই মূল সমস্যার মধ্যে চীনের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী হ'ল তার 'খোদ চাষীর হাতে জমি' দেওয়ার ভিত্তিতে ভূমি-সংস্কার।

এই সংস্কার সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হলে আগে দু'কথায় চীনের মূল অর্থনীতিক সমস্যাটা জানা দরকার।

১৯৩৭ সালে চীন-জাপান যুদ্ধের শুরুতে দেশের যে পুঁজি খাটত, তার বারো আনা ছিল বিদেশীদের মুঠোয়। এই বিদেশী পুঁজির মূল উদ্দেশ্য ছিল চীনকে গোলাম বানিয়ে তার কাঁচামাল জলের দরে হাত ক'রে নিজেদের তৈরী মাল চড়া দামে চীনের গরীব জনসাধারণকে কিনতে বাধ্য করা। চীনে এক মাঞ্চুরিয়ার ইস্পাত কারখানা ছাড়া, ভারী শিল্প ছিল না বললেই হয়। শিল্প উৎপাদনের মান এখনও যথেষ্ট উঁচু নয়। ১৯৪৫ সালে জাপানীদের পতনের পর তাদের অধিকৃত প্রায় সব শিল্পই কুয়োমিণ্টাং-এর একচেটে পুঁজিপতি "চার গুষ্টি"র (চীনের সমস্ত শিল্পেই এ সময় এই চারটি পরিবার একচ্ছত্র হয়ে পড়ে; ফলে ছোট শিল্পপতিরা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়) আওতায় চলে আসে। এদের নৃশংস অত্যাচার ও ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি এদের দাস-মনোভাব দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ মনে দাউ দাউ করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এমন কি যে সমস্ত মাঝারি ও ছোট শিল্প-পতিরা এদের অত্যাচারে নিজেদের অস্তিত্ব হারাচ্ছিল, তারা জনসাধারণের পক্ষ নিতে শুরু করে।

বলা বাহুল্য, চিয়াং কাই-শেকের পরিবার এই "চার গুষ্টি"র অন্তর্ভুক্ত। এরা গৃহযুদ্ধের উস্‌কানি দিয়ে দেশের অর্থনীতিক অবস্থা এমন করে ছাড়ল যে এ-সময়ের মুদ্রাস্ফীতি সাংঘাতিক আকার নিল। মানুষ নোটকে মোটের মত বইত। এক বস্তা নোটের বদলে একটি ছোট্ট মুরগীর ডিম কিনে হয়তো বা দু'জনে মিলে ভাগ করে খেত।

অবস্থা আরও সঙ্গীন হল। যখন জোয়ারের জলের মত মুক্তি-ফৌজ এগোতে লাগল, যখন মাও সে-তুং, চু-তে প্রমুখ নেতারা ছ'মাসের মধ্যে দেশ স্বাধীনের বার্তা ঘোষণা করলেন—তখন ভয়-খাওয়া কুকুরের মত কুয়োমিণ্টাং ফৌজ অসহায় দেশবাসী, শিশু-নারী-বৃদ্ধ সবাইকে কোতল করে ফেলতে লাগল। তারা পোড়ামাটি নীতিতে ভেঙ্গে ফেলতে লাগল কারখানা, ঘরবাড়ী! যেখানে সম্ভব হল, সেখানে কারখানার যন্ত্রপাতি খুলে চালান করতে লাগল তাইওয়ানে। বিশাল চীনে লুঠ করা মাল রাখবার তারা আর জায়গা খুঁজে পেল না। তাই মার্কিণীদের রক্তাক্ত থাবার নীচে বেইমান চিয়াং তার লুঠের জিনিষ জমাতে লাগল তাইওয়ানে। চীনের অর্থনীতিক অবস্থা হল আরও সাংঘাতিক।

যখন গণ-সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে তখন এমনি ছিল চীনের অর্থনীতিক অবস্থা। জমিদারদের অত্যাচারে যেমন বেশীর ভাগ চাষী ছিল জমিহীন, দুর্ভিক্ষ ছিল তাদের সঙ্গের চিরসাথী—তেমনি বেকার মজুর আর মধ্যবিত্তের ভীড়ে পথচলা ভার ছিল। এই বিরাট অর্থনীতিক সমস্যা আলোচনা কবতে গিয়ে লিউ শাও-চি একদিন আমাদের বলেছিলেন:

"আমরা চীনের অর্থনীতিক সমস্যাকে খুব বাস্তব ভাবে দেখেছি। অনেকে মনে করেন আমাদের হাতে ক্ষমতা আসা মাত্র শিল্প, জমি সব কিছু রাষ্ট্রেব আযত্তে এনে ফেলে সরাসরি সমাজতান্ত্রিক নীতিতে রাষ্ট্র চালানো উচিত ছিল। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অবস্থা বিবেচনা করে আমরা দেখেছি চীনের পক্ষে এখুনি সমাজতান্ত্রিক কায়দায় পুরোপুরি সরকার পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই আমরা আমাদের অর্থনীতি ও সরকারের গঠনকে নয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়েছি।

"শিল্পের দিক থেকে চীন এত পশ্চাদপদ যে, আমরা যতদিন এর শিল্পজাত উৎপাদন দশ ভাগ থেকে ত্রিশ ভাগে নিয়ে যাবার মত অবস্থার সৃষ্টি করতে না পারছি, ততদিন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়।

"এর জন্যে আমরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি তা হ'ল: আমরা প্রথমেই জাপানী, কুয়োমিণ্টাং-এর "চার গুষ্টি"ও বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের সমস্ত সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করেছি। ফলে সরকারের হাতে শিল্পের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এসে গেছে। বাকি পঞ্চাশ ভাগের মধ্যে সাড়ে পাঁচ ভাগের মত রয়েছে দেশী পুঁজিপতিদের হাতে। শতকরা দশ ভাগ রয়েছে অন্যান্য বিদেশী পুঁজির অধীনে। বাদবাকি অংশ যৌথ কারবারের তত্ত্বাবধানে চলে। আমরা যে শুধু দেশী পুঁজিপতিদের শিল্প বাজেয়াপ্ত করিনি তাই নয়, এমন কি আমরা যেসব কারখানায় অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ তৈরী হয় তাদের জন্যে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি।

"দেশী পুঁজিপতি বা যারা বিদেশী মূলধন আজও খাটাচ্ছে, মজুরদের অবাধে শোষণের দিন তাদের আর নেই। সরকার প্রকৃত গণ-সরকার হওয়ায় এদিকে কড়া নজর আছে। দেশ জুড়ে ইউনিয়ন গড়ে উঠছে, যাতে মজুরদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও দাবীর চেতনা জেগে ওঠে। কারখানায় কারখানায় রাজনৈতিক পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া আইন তো আছেই।

"কৃষি সমস্যা সমাধান করতে আমাদের এই প্রধান নীতি মনে রাখতে হয়েছে—চীনকে কৃষিপ্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করা আমাদের মূল দায়িত্ব। কারণ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিৎ চীনের বুক থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হ'লে এই বাস্তব অবস্থা বোঝা দরকার। এ কথা বোঝা দরকার যে, চীনে আজ সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক দিক থেকে পরাজিত হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী। জাতীয় শিল্প গড়ে তোলাই হল এদের কাবু করার মোক্ষম অস্ত্র।

"তাই কৃষি ব্যাপারে আমরা প্রথমত সামন্ততন্ত্রের ও সাম্রাজ্যবাদের মূল অবলম্বন জমিদারী প্রথাকে বিনষ্ট করেছি। কিন্তু ধনী চাষীর সম্পত্তি আমরা বাজেয়াপ্ত করিনি, আমরা জমিহীন চাষীর হাতে জমিদারের বাজেয়াপ্ত জমি বিলি করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য এইসব গরীব চাষী ক্রমশ ধনী চাষী হয়ে উঠুক। তারা শিল্পে টাকা খাটাক এই আমরা চাই। এদের আমরা বলি নতুন ধরনের ধনী চাষী। শিল্পোন্নতির জন্যে, এমন কি যেসব জমিদারের টাকা কোন শিল্পে খাটছে সে টাকা অবধি আমরা বাজেয়াপ্ত করিনি।

"আমাদের সরকার বিভিন্ন দল ও গণসংগঠনের সমন্বয়ে তৈরী। কমিউনিস্ট পার্টি এর নেতৃত্ব করে।

"সমাজতন্ত্র কায়েমের এ এক ধাপ। আগামী দশ-বিশ বছরের মধ্যে আমাদের এই সব অসংখ্য ছোট বড় শিল্পপতি, ধনী চাষী সমাজতন্ত্রের পথে এগুবার পথে চীনদেশে যেদিন সত্যিকারের বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেদিন আমাদের আবার একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের পার্টির বিশ্বাস আছে সে লড়াইতে আমরা জিতব।"

চীনের অর্থনৈতিক সমস্যাকে সেদিন এমনি সরল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন লিউ শাও-চি।

উ সু-চাং গ্রামে ভূমি-সংস্কার দেখতে যাবার পথে আরও বিশদভাবে এ-অঞ্চলের কৃষক সংগঠকরা তাঁদের জমির সমস্যা, বিশেষ করে ভূমি-সংস্কারের সমস্যা বোঝাচ্ছিলেন।

ধরুন, মুক্তিফৌজ একটি গ্রাম মুক্ত করেছে, অথবা মুক্ত করবার তোড়জোড় করছে। মুক্ত গ্রাম হলে খোলাখুলি ভাবে আর শত্রুর অধিকৃত গ্রাম হলে লুকিয়ে চুরিয়ে গ্রামের কর্মীরা যেত "বুনিয়াদী লোক" খুঁজে বার করতে অর্থাৎ, গ্রামের যেসব পাকাপোক্ত লোকের ওপর নির্ভর করে সংগঠন গড়ে উঠতে পারে। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রচার করা। মুক্তি-ফৌজ, কমিউনিস্ট পার্টি, ভূমি-সংস্কার কার্যকরী করবার অবস্থার সৃষ্টি করা, বিশ্বাসঘাতক আর জমিদারদের শাস্তি দেবার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও প্রচার চালানোর

ভেতর দিয়ে ভিৎ পাকা হত। এ-ধরণের কাজে বেজায় মুশকিলে পড়তে হত বিশেষ করে সেই সব গ্রামে, যেখানে বার বার রক্তাক্ত যুদ্ধের ফলে কুয়োমিণ্টাং আর মুক্তি-ফৌজের মধ্যে কে যে স্থায়ীভাবে জিতবে গ্রামবাসীরা তা না বুঝতে পেরে দোটানায় পড়ত। তারা প্রচারকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ভয় পেত। হতাশার স্বরে পরস্পরকে বলত, "ও কিছু নয়, আকাশ বদল"—অর্থাৎ ক্ষণেকের জন্যে গ্রামের মালিক বদল।

তবু কাজ ও হাতেনাতে তার ফলাফলের ভিত্তিতে গ্রামবাসীর মনে আস্থা জেগে উঠত। মুক্তির পরেই অবিলম্বে গ্রামের অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হত। সরকারের কাজ চালাবার জন্যে প্রথমত নিয়োজিত হত গ্রামের একজন মোড়ল, একজন পুলিশ-কর্তা, গ্রাম্য রক্ষী-বাহিনীর কর্তা ও একটি অর্থ-দপ্তর। অর্থ-দপ্তরের কাজ ছিল নিয়মিত কর আদায় করা, মুক্তি-ফৌজের জন্যে রসদ সংগ্রহ করে পাঠানো, গ্রামের অর্থনীতিকে সুষ্ঠুভাবে চালাবার দিকে দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি। কমিউনিস্ট কর্মীরা তৎপর হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি কমিটি তৈরী করত—যাতে গ্রামের কমিউনিস্ট কর্মীরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ চালাতে পারে। এ অবস্থায় কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রধান কাজ হ'ত "বুনিয়াদী লোক" দের সাহায্যে ধৈর্য সহকারে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সভায়, দৈনন্দিন কথার ভেতর দিয়ে গ্রামবাসীদের কাছে জমিদার, সুদখোর মহাজন, বিশ্বাসঘাতক, উস্কানিদাতা গুপ্তচরদের স্বরূপ প্রকাশ করা। এই সব আলোচনার ভেতর তারা বিশেষভাবে বোঝাত কেন "গরীব চাষী সংঘ" গড়া দরকার, জমিহীন চাষীদের মধ্যে কেন অত্যাচারীদের বাজেয়াপ্ত জমি ও বিষয়সম্পত্তি বিলি করা দরকার, অথবা চাষীদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসত। আসল কাজ তখনই শুরু করা সম্ভব হত, যখন গরীব চাষীরা তাদের নিজেদের অধিকার বুঝতে এবং দাবী আদায়ের জন্যে লড়তে প্রস্তুত হত। এর আগে শুধু প্রচার ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব হত না। জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত থেকে জমি বিলি—সবই শুরু হত চাষীরা নিজেরা বোঝার এবং নিজেরা নেতৃত্ব নেবার পর থেকে।

এর পর জোর কাজকর্ম শুরু হ'ত। "কুকুরের পা-"দের অর্থাৎ, বিশ্বাস-ঘাতকদের শাস্তির জন্যে প্রথমে সকলে উঠে পড়ে লাগত। এটাই হত তখন মূল সমস্যা। বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়া হত গ্রামবাসীদের সাক্ষীর ভিত্তিতে। "অভিযোগ সভায়" ফেটে পড়ত চাষীদের যুগ যুগ সঞ্চিত রাগ। আগুনের সলার মত বেরিয়ে আসত অভিযোগ। কখনও মায়েরা চোখের জলে ভিজিয়ে দিত সকলের মন। কখনও বা কোন অল্প বয়সী ভাগচাষীর ধারালো যুক্তির জোরে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে যেত চাষীদের মনে। এই সব সভায় "বুনিয়াদী লোকেরা" মাথা ঠাণ্ডা করে যুক্তিতর্ক করত। হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে যেতঃ জমিদার, সুদখোর মহাজন, বিশ্বাসঘাতক, উস্কানিদাতা ছদ্মবেশী গুপ্তচর—এরাই হল চাষীর চরম দুর্দশার মূলে। এই সব "বুনিয়াদী লোকেরা" গাঁয়ের নেতা বলে স্বীকৃত হত।

তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ত একটি জিনিষ—জমিদার, সুদখোর মহাজন, বিশ্বাসঘাতক আর উস্কানিদাতা ছদ্মবেশী গুপ্তচরদের সম্পত্তি বিনা শর্তে বাজেয়াপ্ত করা। জমিদারের সম্পত্তির কোন অংশ যদি শিল্পে খাটছে এমন হত, তাহলে সে অংশ বাজেয়াপ্ত করা হত না। যেসব জমিদারদের সংসার জমির আয়ের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত, তাদের গরীব চাষীর সমান জমি দেওয়া হত এই শর্তে যে, জমি তারা গতর খাটিয়ে চষে খাবে। যে সমস্ত ধনী চাষী টাকা সুদে খাটিয়ে খেত কিম্বা যাদের জমি ভাড়া-করা দিন-মজুরের গতর খাটার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত এবং যারা নিজেরা চাষে কোন অংশ গ্রহণ করত না, তাদের জমিও বাজেয়াপ্ত করা হত।

বিশ্বাসঘাতকদের সচরাচর জেলে যেতে হত। এবং যে যার অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কমবেশি সেখানে বসবাস করত।

ভূমি সংস্কারের আগে, অনেক জায়গায় "খাজনা কমানো" ও "দেনা পাওনা মেটানো" এই দুই আন্দোলনের মারফৎ চাষীদের সংগঠিত করা হত। "দেনা-পাওনা মেটানো"র আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল—জমিদারের অত্যাচার বোঝানোর জন্যে চাষীর কাছ থেকে জমিদার যত সুদ নিয়েছে, খাজনা নেবার নামে যত জমি

হাতিয়ে নিয়েছে, তা স্থদে আসলে মিটিয়ে নেওয়া। এ আন্দোলন চাষীর চোখ খুলে দিত ; কারণ, তারা স্বচক্ষে দেখতে পেত কী অন্যায়ভাবে জমিদার তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে, তার বাড়ী ক্রোক করেছে। তারা অবাক হয়ে ভাবত এসব কেন আগে তাদের চোখে পড়েনি। অনেক সময় এই দেনা পাওনা মেটাতে গিয়ে অনেক জমিদার সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যেত—নিজেদের তৈরী করা দেনায় নিজেরাই দেউলিয়া! চাষীরা ভাবত—এতদিন কী অন্যায়টাই সয়েছি!

কখনও কখনও কোন অতি-চালাক জমিদার নিজেদের গণ-সরকারের চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে ভূমি-সংস্কারের আগেই লুকিয়ে সম্পত্তি বিক্রি করে দিত। গহনা, টাকা ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত হবার আশঙ্কায় অনেকে মাটির নিচে তা লুকিয়ে রাখত। ধরা পড়লে তাদের হৈ-হল্লা করে গাঁ থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হত—সচরাচর গাধার পিঠে চড়িয়ে। এই "ল্যাজ-কাটা" আন্দোলনের সংগঠকরা হেসে বলত, "সব চালাক শেয়ালদেরই ল্যাজ কাটতে হয়।"

চীনের প্রায় সব গাঁয়েই ভূমি-সংস্কারের পরেই প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারাগুলো খুলে গিয়েছে। ভূমি-সংস্কার চাষীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি আমূল পরিবর্তন আনে। প্রথমত, তারা নিজেদের দেশের জমির মালিক হিসেবে এক নতুন দায়িত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের এই প্রথম পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়ার ফলে ভূমি-ব্যবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনেও সমস্ত পুরনো সম্পর্কগুলোর এক নবজন্ম হয়েছে। মেয়েরা সামাজিক উৎপাদনে পুরুষের সমানে সমানে অংশ নেওয়ার দরুণ তাদের পুরনো দাসত্ব-শৃঙ্খলের শেষ হয়েছে। এই বদল চীনের মানুষকে এক নতুন স্তরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। দেশের অর্ধেক, যারা সামাজিক উৎপাদনের কাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য ছিল—তাদের মুক্ত শক্তি অপর অর্ধেকের মুক্ত হাতে হাত মিলিয়ে চীনের জমিতে সোনা ফলাচ্ছে।

ভূমি-সংস্কারের ফলে সমস্ত জমিহীন চাষীদের জমি দেওয়া হয়। যাদের একেবারেই কোন জমি ছিল না, তাদের পরিবারে মাথা পিছু পায় তিন "মু" জমি —অন্তত পক্ষে দেড় বিঘার মত। যাদের অল্প জমি ছিল, তারা এই হিসেব

অনুসারে বাড়তি কিছু জমি পাবে। যাদের পরিবার সম্পূর্ণভাবে জমির আয়ের ওপর নির্ভর করে না, তারা প্রয়োজন অনুপাতে কমবেশী ভাগ পাবে। এবং সকলেরই জমির পাওয়ার শর্ত একটি—জমিতে চাষ করতে হবে।

এই চাষ করার ব্যাপারে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রথমত, যে পরিবারে কর্মঠ পুরুষ নেই—আছে হয়ত শিশু ও বৃদ্ধা—তাদের জমি যাতে পতিত হয়ে না যায় তার জন্যে নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যে পরিবারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী কর্মঠ লোক আছে, সে পরিবার থেকে একজন অথবা বেশী লোককে দিয়ে এই ধরণের অসহায় পরিবারের জমিতে লাঙল দিয়ে ফসল বুনবার ব্যবস্থা করা হয়; এই ব্যবস্থা হয় গ্রামের চাষী প্রতিষ্ঠান বা কো-অপারেটিভের মারফৎ। দ্বিতীয় সমস্যা—যেটা চাষীরা বিশেষ করে বোধ করতে লাগল—সেটা হল যন্ত্রপাতি, ঘোড়াবলদের অভাব। এই অভাব এত সাংঘাতিক যে, চীনে হাজার হাজার চাষী পরিবারে মানুষে লাঙল টানতে বাধ্য হয়। এই অভাবের দরুণ তারা নিজেরাই অনুভব করে যে ভাগে লাঙল, ঘোড়া, বলদ যৌথভাবে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। এ ব্যাপারে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ মুশ্‌কিলে পড়ে। জমি পেলেও তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে—এ ঠাণ্ডা পাথরের মত জমিকে ভাঙবে কী দিয়ে! যেখানে ভাগে পায় ভালো, নয়তো নিজেরই দুর্বল কাঁধে দড়ি পরিয়ে লাঙল টানে। মুখ লাল হয়ে ওঠে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়, দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ে। তবু তারা হাসে। বলে, "আজ কষ্ট করলে কাল ঘোড়া পাব। আজ বসে থাকলে কাল খাবো কী? তাছাড়া জমি আমার। তাকে চষবার দায়িত্ব আমার।"

চীনে এখনও যৌথভাবে জমি চাষ করার আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তার প্রধান কারণ, এ আন্দোলন শুরু করার মত বাস্তব অবস্থা চীনে আজও হয়নি। প্রথমত চাষীর হাতে সবেমাত্র জমি যাওয়ায় তার "জমির ক্ষিদে" অর্থাৎ তার যুগ যুগ ধরে দেখা জমির স্বপ্ন আজ সবে সার্থক হয়েছে। জমিতে যৌথভাবে চাষ করলে তার যে বিশেষ সুবিধে, সে অভিজ্ঞতা চীন দেশের চাষীর এখনও হয়নি। এর কারণ, শিল্পের দিক দিয়ে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ হওয়ায় সরকারের পক্ষে এখুনি ব্যাপকভাবে "যৌথ-খামার" গড়া সম্ভব নয়; তার জন্যে চাই ট্র্যাক্টর প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে

খুব বড় আকারে জমি-চাষের ব্যবস্থা ভাল। চীন সরকারের পক্ষে এখনও তা করার অবস্থা নেই। কাজেই চাষীর মানসিক আর সরকারের আর্থিক কোন দিক দিয়েই ব্যাপকভাবে যৌথ-খামারের আন্দোলন গড়ে তোলার এটা ঠিক সময় নয়।

তবে ব্যাপকভাবে কৃষি সমবায় গড়ে তোলার বিপুল আয়োজন এখানে চলেছে। এ-আন্দোলন চাষীর কাছে সমবায় প্রথার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছে। এ আন্দোলন চাষীর মনকে "যৌথ-খামার আন্দোলনের" জন্যে তৈরী করছে।

সমবায় আন্দোলনকে সরকার নানাভাবে সাহায্য করে। একটি সমবায়ে আমরা দেখলাম তৈরী এবং বিক্রি দুই-ই হচ্ছে। সমবায়টি সরকার ও স্থানীয় চাষীদের সম্পত্তি। সরকার সুতো কিনে সমবায়ে দেয়। চাষীরা কাপড় বোনে। সরকার কাপড় নিয়ে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে। চাষীরা মজুরী পায়। লাভের অংশ মূলধনে থাটে। চাষীদের সম্পূর্ণ নিজেদের তত্ত্বাবধানেও বহু বেচাকেনার সমবায় গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলন চাষীদের জীবনযাত্রার মান উঁচুতে তোলার কাজে বিশেষ সহায় হয়েছে। চীনের গ্রাম্য অর্থনীতির শতকরা ত্রিশ ভাগ হল হস্তশিল্পের উৎপাদন। পুরনো আমলে শহরের মুনাফাখোর কারবারীর হাতে পড়ে এই সব জিনিষ চাষীর হাত থেকে জলের দরে বিকিয়ে যেত। যে সব চাষী আলাদা আলাদা ভাবে মুনাফাখোর মহাজনদের কাছে মাল বেচত, এই সব সমবায়ের মারফৎ বিক্রির ব্যবস্থার ফলে তাদের অনেক বেশী লাভ হয় এবং দলে দলে সমবায়ের সভ্য হবার জন্যে চাষীদের মধ্যে ঝোঁক দেখা যায়।

ভূমি-সংস্কারের নানা সমস্যা ও নানা উজ্জ্বল দিকের কথা শুনতে শুনতে আমরা কখন যে উ সু-চাং গাঁয়ের কাঁচা রাস্তায় এসে পড়েছি, খেয়াল নেই। দূরে চিরপরিচিত লাল ঝাণ্ডা দেখে জিজ্ঞেস করতেই সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার জানাল আমরা প্রায় পৌঁছে গিয়েছি।

যখন গাঁয়ে পৌঁছলাম, ঠিক দুপুর। গাড়ী চলার মত কোন পথ না থাকায় আমাদের গাড়ী পায়ে-চলা-পথের চিহ্ন ধরে ইঁটপাট্‌কেলের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে এগিয়ে একেবারে চাষী ইউনিয়নের আপিসের সামনে এসে থামল। এ-আপিসটা

আগে ছিল এখানকার জমিদারের বাস্তুভিটে। বাড়ীর বাইরের দিককার বড় উঠোনে মস্ত এক মিটিং চলেছে। একজন চাষী নেতা সেদিনকার "ফলভাগ"-এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন। "বিপ্লবের ফলভাগ হচ্ছে"—চাষী নেতা বলছিলেন, "এ ফল সাধারণ মানুষের জন্যে। এ ফল তাই ভাগ করার দায়িত্বও আমাদের, ভোগ করার অধিকারও আমাদের।"

বাড়ীর গায় লাগানো ছোট উঠোনটি বড় উঠোনের সঙ্গে পাঁচিল দিয়ে ভাগ করা। ছোট উঠোনে থরে থরে "ফল" সাজানো। লাঙল থেকে শুরু করে ব্যবহার করার দড়ি অবধি—সব পরিস্কারভাবে সারি সারি রাখা হয়েছে। চাষের নানান রকম জিনিষ। এই বিংশ শতাব্দীতে চাষের এমনি আদিম যন্ত্রপাতি দেখলে অবাক হতে হয়। লাঙলগুলো প্রায় আমাদের লাঙলের ধরনেরই (আমাদের চাষের যন্ত্রপাতি অবশ্য চীনের চেয়ে কোন অংশে উন্নত নয়—তবু যত বার যেখানে এ যন্ত্রপাতি দেখি, অবাক হই)—কোন রকমে মাটির ওপরটায় একটু আঁচড় কাটে। আমি একটু হতাশভাবে যন্ত্রগুলো পরীক্ষা করছিলাম দেখে গাঁয়ের কমিউনিস্ট পার্টি কমিটির সম্পাদক বললেন, "আমাদের এ সব মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়েই কাজ চালাতে হয়। উপায় নেই। এ যন্ত্রপাতি দিয়ে কখনও সোনার ফসল আশা করা যায় না। কৃষিকে বিজ্ঞানের সাহায্যে, যন্ত্রের সাহায্যে উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে হবে। যেমন ওরা সোভিয়েট ইউনিয়নে করেছে। চীনের কৃষির উন্নতি সেই পথে হবে। কিন্তু এখন আমাদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে সব কিছু করা সম্ভব নয় বলে আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো তা মোটেই নয়। যত আদিমই হোক, এই হাতিয়ারই আজ আমাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লাগাতে হবে। যতদিন না মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ আর কুয়োমিণ্টাং-কে তাইওয়ান থেকে হটিয়ে আমাদের মাতৃভূমিকে পবিত্র করতে পারছি, ততদিন ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়—আমাদের যা আছে তাই আজ কাজে লাগাতে হবে।"

উ স্থ-চাং গাঁয়ের লোকসংখ্যা প্রায় হাজার খানেক। তাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক রেল মজুর, ২.৮% জমিদার (৭টী পরিবার), ৪.৪% ধনী চাষী এবং বাদ বাকি জমিহীন, গরীব আর মাঝারী চাষী। ৩০৪০ মু (প্রায় আধ বিঘায় এক মু) আবাদী

জমির মধ্যে ১৫০০ মু ছিল জমিদার আর ধনী চাষীদের আয়ত্তে। পুরনো চীনের অন্য সব জায়গার মত গরীব চাষীর ওপর অত্যাচার এখানেও এত নির্মম ছিল যে চাষীরা খাজনা, সেলামী ইত্যাদি বাবদ তাদের উৎপাদনের ৭০%ভাগ জমিদারকে দিয়ে দিতে বাধ্য হত। জমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর খাজনা ধার্য হত না। হত জমির মাপ অনুসারে। এতে গরীব চাষীকেই মরতে হত; কারণ, ধনীরা আগেভাগে ভাল জমিগুলো দখল করে বসত এবং গরীব চাষীর চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন করতে পারত। এখন অবশ্য নতুন সরকারের আইন অনুসারে জমির উৎপাদন ক্ষমতার ওপর খাজনা বসান হয়।

গ্রামে এইসব দৈনন্দিন দুর্দশার ওপর ছিল ধর্মের নামে অত্যাচার। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা গ্রামে গ্রামে বুজরুকীর সাহায্যে চাষীকে ঠকাত। একদিকে যেমন টাকা লুঠত, তেমন অন্যদিকে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষীদের না লড়বার উপদেশ দিত। চাষীদের হাড়মাস কালি করার জন্যে আরও একজাতের লোক ছিল। তারা হল জমিদারের পাইক-পেয়াদা। সমস্ত গ্রাম জুড়ে ছিল নিরক্ষরতা আর কুসংস্কার। উ সু-চাং গাঁয়ে মাত্র দুটি ধনী চাষীর ছেলে লিখতে পড়তে জানত। বাদবাকি ছিল সম্পূর্ণ নিরক্ষর।

ফলে, এ গাঁ মুক্ত হবার পরেও কিছুরই প্রায় হদিশ করা যায়নি। জেলা আপিস থেকে তিনজন কর্মীকে প্রথমে পাঠান হল এখানকার ভূমি-সংস্কারের কাজ এগিয়ে নেবার জন্যে। তারা প্রথমে কিছুই করে উঠত পারেনি। "বুনিয়াদী লোক" খুঁজে হয়রান হল তারা। গাঁ জুড়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে তারা প্রচার সুরু করল। বাড়ী বাড়ী, জনে জনে ধরে ধরে বোঝাল কেন এই সংস্কার, কেন সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। অবশেষে ডাকা হল কৃষক সম্মেলন। এ গাঁয়ের জীবনে এই ধরনের সম্মেলন এই প্রথম। সম্মেলনের ভেতর দিয়ে উনত্রিশ জন সভ্য নিয়ে এক কমিটি তৈরী হল। দেখতে দেখতে কৃষক প্রতিষ্ঠানের সভ্য সংখ্যা হল তিন শো।

এবং তখনই সুরু হল আসল কাজ। যুগ যুগ ধরে যে সব সমস্যা এরা কোনদিন বোঝেনি, বুঝতে চেষ্টা করেনি—সে সব সমস্যা প্রত্যেক দিন তাদের

সামনে পরিস্কার হয়ে যেতে লাগল। তাদের মনে পড়তে লাগল গ্রামের জমিদারের অত্যাচারের কথা। অনেকের মনে পড়ল, খাজনা দিতে পারেনি বলে বউ কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল জমিদার। কারুর বা মনে পড়ল সুন্দর ষোল বছরের মেয়েটিকে জমিদারের ভোগে পাঠাতে হয়েছিল, জমিদারের ছেলের বিয়েতে এক-টাকা সেলামী দিতে পারেনি বলে। তখন ভবিতব্য বলে সয়েছিল। এখন সেই চাপা-পড়া রাগ আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়তে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে শুরু হল ভূমি-সংস্কারের প্রথম ধাপ—জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত, বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি।

আর ঠিক এমনি শুভ সময়ে আমার এদের সঙ্গে পরিচয়। নতুন জীবনের স্বাদ যেন কুল ছাপিয়ে উঠেছে।

কৃষক সমিতির সম্পাদক বাড়ীর ডান দিকের উঠোনের শেষে পাঁচিল পেরিয়ে নিয়ে গেলেন। আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন, "ঐ যে তিনখানা ছোট ছোট ঘর দেখছেন। ওতে আগে জমিদারদের ক্রীতদাসরা থাকত। এখন তিনঘর জমিদার থাকে। ওদের পরিবার পিছু দশ মু করে জমি দেওয়া হয়েছে। ওরা অন্য সকলের মত পরিশ্রম করলে আর সকলের মতই খেতে পাবে।" বলতে বলতে অল্প হেসে আরেক দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ঐ দেখুন, জমিদারের বৌ অনভ্যস্ত হাতে চাষী মেয়েদের মত দড়ির জুতো তৈরী করছে। ওদের এখন জানা উচিত শ্রম হল সম্মান, পরগাছার জীবন-যাপন ঘেন্নার বিষয়।" শেষের কথা ক'টা একটু গলা চড়িয়ে বললেন। তারপর আপন মনে খানিক হাসলেন। বোধহয় কল্পনা করছিলেন কুঁড়ের ভেতরে বসে বিষ দাঁত ভাঙা গোখরো সাপের মত জমিদারেরা দাঁতে দাঁত ঘষছে।

আমি যখন বাইরের উঠোনে ফিরে এলাম তখন ভাগ সুরু হয়েছে। চিৎকার করে হেঁকে একজন বলছে,—"অমুক দলের নেতা……" এবং হয়ত বা একখানা খচ্চরের গাড়ী তার হাতে তুলে দিচ্ছে। একটি গাড়ী দেখলাম ছ'টি পরিবারের জন্যে দেওয়া হল। তারা যৌথভাবে ব্যবহার করবে। লাঙল বা অন্যান্য সব কিছুকেই এই ভাবেই ভাগ করা হয়েছে। একটি পরিবারকে গোটা একটা কিছু দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনি সাংঘাতিক গরীব এই গাঁ।

তখনও চারিদিকে ছোট ছোট দল বসে আলোচনা সভা করছে। প্রত্যেক দলের নেতা তার সাঙ্গোপাঙ্গদের আপ্রাণ বোঝাচ্ছে। কী আলোচনা চলছে জানতে একটি দলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম উটের মত গলা বাড়িয়ে এক চাষী গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটি ছোকরাকে বলছে কেন তার চাষ-বাসের জন্যে একখানা কাস্তে চাই। ছোকরাটির বছর আঠারো বয়েস। শুনছে আর ধরে ধরে কি সব লিখছে। শুনলাম সে এই মাত্র ক'দিন আগে লিখতে শিখছে। এখানে এই ধরনের উৎসাহী ছেলেদের চটপট শিক্ষিত করবার জন্যে নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। সেখানে বিশেষ করে ভূমি-সংস্কারের কাজ চালাবার জন্যে যা যা জানা দরকার তাই শেখানো হয়। একটি সাধারণ ইস্কুল খোলার জন্যে একটি জমিদারের বাড়ী মেরামত করে নেওয়া. হয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই গোটা গাঁয়ের প্রত্যেকটি বাড়ীর বাচ্ছারা ইস্কুল যাবে। তাদের মা-বাপের বুক গর্বে ভরে উঠবে।

একদল অল্প বয়সী চাষী ছেলে গান ধরল। মেয়েরা মাঝখানে যোগ দিল। একজন বৃদ্ধ আর একজনকে ঠেলা মেরে অকারণে হাসতে আরম্ভ করেছে। ছোট বাচ্ছারা চেঁচামিচিতে চতুর্দিক অস্থির করে তুলেছে। যারা মাঝ-বয়সী—তারা একটা গাম্ভীর্য রাখার চেষ্টা করছে। মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটাকে এরা আরও ভেবে দেখতে চায়। বিশ্বাস হয় না। গানের মাঝে মাঝে আকাশ কাঁপিয়ে আওয়াজ উঠছে—"মাও সে-তুং জিন্দাবাদ" "মুক্তি ফৌজ জিন্দাবাদ" "শান্তি জিন্দাবাদ।" আকাশের দিকে তাকালাম। স্ফটিকের মত পরিস্কার। নীল। গভীর শান্ত নীল।

একটি বছর আঠারোর মেয়ে। উত্তেজনায় লাল গাল দুটো ফেটে পড়তে চাইছে। পেস্তার মত চোখ, ওপর দিকে টানা। ছোট চোখ, বিশেষ করে চীন দেশীয়দের মত ছোট চোখকে সাধারণ ভাবে আমাদের দেশে অসুন্দর বলা হয়। মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে বুঝলাম এ-কথা কত ভুল। তার চোখে যেন জীবন ঠিক্‌রে পড়ছে।

মেয়েটি আমাকে ঠেলে একটু জায়গা করে নিয়ে গা ঘেঁষে বসল। চোখে হাসি

ঠিক্‌রে বলল, "কি যে সব হচ্ছে—কল্পনা করা যায় না। এই তো সেদিন প[র্য]ন্ত—শুধু হেঁসেল আর গোয়ালঘর করেছি। আজ মেয়েরা গান গাইছে—রাস্তায়, ছেলেদের সঙ্গে। আগে হলে ঢি-ঢিক্কার পড়ে যেত। তোমাদের দেশে হয়তো মেয়েরা এসব বুঝবে না, হয়তো তোমরা এত সাংঘাতিক জীবনের কথা ভাবতেই পারো না। যেদিন অক্ষর চিনলাম, জমি পেলাম, জানলাম পুরুষের চেয়ে আমি কোন দিক দিয়ে ছোট নই—সেদিন কী যে গান গাইতে ইচ্ছে হল! কী সহজে গান আসে যে আজকাল! থামানো যায় না।" আমাদের দেশের মেয়েদের অবস্থার বর্ণনা শুনে মেয়েটি এক মুহূর্ত দমে গেল। তারপর উৎসাহে লাফিয়ে উঠে বলল, আমাদের "সভাপতি মাও সব দিয়েছেন আমাদের। তোমরাও এমনি স্বাধীন হবে। ভয় কি? বিশ্বাস রেখো। আমাদের কথা তোমার দেশের মেয়েদের ব'লো। ওদের ব'লো এসব সত্যি এবং সম্ভব।"

ভাগবাঁটোয়ারা প্রায় শেষ। চাষীরা এতক্ষণে আমার দিকে নজর দিয়েছে। সকলে ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন তুলেছে। অনেকে বার বার চেষ্টা করছে খুব পরিস্কার করে তাদের মনের অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে। কিন্তু এত কথা কিছুতেই গুছিয়ে বলতে পারছে না। "ভারতবর্ষেও কি এমনি জমি দেওয়া সুরু হয়েছে? হয়নি? আশ্চর্য! আমরা তো ভাবছিলাম সবদেশেই এমনি হতে সুরু হয়েছে"—একজন বললেন। আর একজন বৃদ্ধ, কথা বলতে গেলে গলার শিরটা কাঁপে, বললেন, "আজকাল লেখাপড়া জানা অনেকেই বলে বুদ্ধ নাকি তোমাদের দেশ থেকে এসেছিলেন। আমি অবশ্য একথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু সে যাই হোক কথাটার মধ্যে হয়ত সামান্য কোন সত্যি আছে। কেন না তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের সম্পর্ক। তোমাদের দেশে আজও জমি বিলি হয়নি? তাহলে সেখানকার চাষীদের কথা বুঝতে পারছি। আমার গায়ের চামড়া এই পঁয়ষট্টি বছর রোদে পুড়ে জলে ভিজে বরফে কুঁক্‌ড়েছে—চাষ করে করে। তবু কোনদিন ভাল করে খেতে পাইনি। আমি তোমার দেশের চাষীর দুঃখু বুঝি—প্রাণ দিয়ে বুঝি।" চারিদিকে চেঁচামিচি, "একটা ইন্দু (ভারতীয়) গান হোক্।" আমি কী গাইব ভাবছি, হঠাৎ ছোঁ মেরে একটি অল্প বয়সী মেয়ে ভীড়ের মধ্যে থেকে

আমায় টেনে নিয়ে এল। "চলো, গাঁয়ের ঘরে ঘরে সকলে তোমায় চা খাওয়াতে চায়। তোমাদের চায়ের খুব নামডাক, আমাদের চা-ও খুব ভাল—পরখ করে দেখবে।" মেয়েটি এত সপ্রতিভ যে, মুহূর্তে স্বাভাবিক হওয়া যায় ওর সঙ্গে। মুখখানা বুদ্ধিতে ঝলমল করছে। চাঁদের মত গোল মুখ। হাসলে গালে টোল খায়! গায়ের চামড়া মাখনের মত মোলায়েম। কাকের মত কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। গ্রামের চাষী সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সভ্য হিসেবে এর নামডাক আছে। চলতে চলতে আমার বাঁ হাতখানা নিজের দু'হাতে ধরে হঠাৎ থেমে বলল, "মাঝে মাঝে আমার বিশ্বাসই হয় না, জানো? আমাকে তো উঠোন পার হতে দিত না কোনদিন। মেয়েদের লাঙল চষার কথা কেউ কোনদিন ভাবতেই পারে নি। স্বাধীনতার পর গাঁয়ে যখন প্রথম মেয়েরা জমি পেল আর চাষের কথা উঠল, তখন গাঁয়ের পুরুষরা তো মারমুখো। বলে, 'মেয়েমানুষ জমি পেয়েছে, তা ব'লে চাষ করা! উচ্ছন্নে যাবে সব।' তারা জমি চাষের কাজে বাধা আনে। বলে জমি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না। আগের দিনে হলে মেয়েরা কখনও ট্যাঁ ফুঁ করতে সাহস পেত না। কিন্তু আজকাল আলাদা দিন পড়েছে। সরকার আমাদের পক্ষে। আমাদের হয়ে লড়ার লোক আছে সর্বত্র। সেজন্যে আমিই প্রথম রুখে দাঁড়াই। বলি, প্রমাণ করে দেব নিজের জমির ওপর। অনেক বাধা আসে। কিন্তু আমি দমে যাইনি। যেদিন ফসল তুললাম, হাতে নাতে প্রমাণ হল মেয়েদের মূল্য।

"আগে মিটিং-এর নাম শুনলে বউদের শাশুড়ীরা ঝাঁটা মারতে আসত। এখন তারা বউদের তাড়া দিয়ে মিটিং-এ পাঠায়, রান্না বান্না দেখে। আমার শাশুড়ীও এখন আমাকে মানুষের মত দেখে। কারণ আমি আজ আর পরিবারের 'বাড়তি পেট' নই। আমি রোজগার করি। আমাকে গাঁয়ের লোকে এখন সম্মান করে। তারা আমায় গাঁয়ের নেত্রী হিসেবে মানে। এবার নির্বাচন ক'রে ওরা আমায় এখানকার চাষী সংগঠনের কার্যকরী কমিটিতে পাঠিয়েছে। আগে চাষী সংগঠনে মেয়ে ছিল না। এখন ৩৪০ জন সভ্যর মধ্যে ১২০ জন মেয়ে। কার্যকরী কমিটির ২৯ জন সভ্যর মধ্যে ৯ জন মেয়ে। আজ গাঁয়ে ৩৫টি ছোট দল ভূমি-

সংস্কারের কাজ চালাচ্ছে। এর মধ্যে ১৪টি দলের ভারপ্রাপ্ত হল মেয়ে। এক বছরের মধ্যে এত বদল। বিশ্বাস হয় মানুষের!” আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা উঁচু টিপিতে উঠল সে। উঁচু থেকে সমস্ত গাঁ-টা চোখে পড়ে। ছোট ছোট মেটে বাড়ীগুলো যেন এক ঝাঁক ধূসর ব্যাঙের ছাতা। পায়ে-চলা পথটি সামনে দিয়ে গেছে, এঁকে বেঁকে। এবড়ো খেবড়ো হয়ে আছে এদিক ওদিক। চাষের জমিতে কোথাও কোথাও জল জমে বরফ হয়ে আছে। আমরা চলতে শুরু করলে পায়ের নীচে বরফ গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। ইতিমধ্যে একদল ছেলেপিলে আমাদের পিছু নিয়েছে। নানা আকৃতির তারা—ছোট, বড়, মাঝারি। তাদের ক্ষুদে কালো চোখগুলো কৌতূহলে অস্থির হয়ে আছে। কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছে আর অনর্গল রেডিওর খবর বলার মত পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের পরিচয়, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলে যাচ্ছে। একটি ছোট্ট ছেলে, বেচারী সম্ভবত সবে হাঁটতে শিখেছে, ছুটতে ছুটতে আমাদের সঙ্গ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অনর্গল বকছে আর মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে “ইন্দু ইন্দু (ভারতীয় ভারতীয়)”।

আমাদের সামনে চাষের লম্বা ফালি ফালি জমি। এখনও লাঙলের ছোঁয়া লাগেনি। এমনি একভাগ জমির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল একটি চাষী যুবক। গায় গাঢ় নীল কুর্তা। হাত দুটো ভারী ভারী। আমাদের থামতে দেখে ছেলেটি কি ভাবল, তারপর নীচু হয়ে এক খাবলা শুকনো মাটি তুলে আমার হাতের মুঠোয় দিয়ে বলল, “এ আমার—আমাদের—সোনার মাটি—” আর গলা কেঁপে উঠল। সে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ব্যথা করে উঠল আমার গলার কাছটায়। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারিনি।

মেয়েটির সঙ্গে আবার চলতে শুরু করলাম। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে চলেছি। পরম আত্মীয়ার মত সে নানা গল্প জুড়েছে। “আমার নাম ওয়াং চিউ চাও—তোমার নাম?” আমার নাম শুনে অনেক চেষ্টা করেও ঠিক উচ্চারণ করতে পারল না। হতাশ হয়ে বলল, “যাক্ গে, বোঝা গেলেই হল।—উঃ তোমাকে কত কথা যে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। অথচ এত সময় কম! সব দেখাতেই তো রাত হয়ে

যাবে। আমার বাড়ীতেই হয়ত নিয়ে যাবার সময় হবে না। ঐ যে সব জমি দেখছ—মেয়েরা চষেছে গতবার। কবে যে আবার চাষ শুরু হবে! হাত নিস্‌পিস্‌ করে আমার। কাজ ভালবাসি। বড্ড কাজ ভালবাসি। জমিগুলোকে চষে চষে ময়দার মত করে ফেলতে ইচ্ছে হয়"। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার দু'হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে হেসে উঠে বলল, "জানো, আমি যে কী সুখী—।" তেইশ বছরের এই বউটি আমার মনে সেদিন যে আশার ছবি এঁকে দিয়েছিল, তা চিরদিন আমাকে আমার জীবন সংগ্রামে প্রেরণা দেবে।

প্রায় সব চাষীদের বাড়ীতেই দারিদ্র্যের চিহ্ন। ছোট ছোট মেটে বাড়ী। খড়ের চালা। একখানা বড় ঘরেই সব কাজ সারা হয়। পাশের ছোট লাগোয়া ঘরে থাকে বাড়তি জিনিষপত্র। বড় ঘরের প্রায় অর্ধেকের বেশীর ভাগ জুড়ে রয়েছে মাদুরে ঢাকা ইটের উঁচু "কাং" (দিনে বসে, রাতে বিছানা হিসেবে ব্যবহার করে)। "কাং"-এর গায় লাগানো উনুন। উনুনটিতে তিনটি কাজ হয়—রান্না করা, "কাং"-এর ইঁট গরম রাখা আর সাধারণভাবে গোটা বাড়ীকে গরম রাখা।

এই রকম ছোট্ট একটি কুঁড়েতে ৬৭ বছরের বুড়ো তুং-এর সঙ্গে আমার দেখা। তুং যেন চীনে রূপকথার গল্প থেকে তুলে আনা। দুধে হলুদে রং, ভাঁজ খাওয়া মুখ। প্রত্যেকটা রেখা গোণা যায়। সাদা ঝুর ঝুরে দাড়ি। পাত্‌লা সাদা চুল। ডোঙা হয়ে বসে গরম রাঙা আলু সেদ্ধ খাচ্ছিল। উনুনের আলোয় মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। মুখের প্রতিটি রেখা যেন দাগ কেটে বসে গেছে। তার ছোট্ট পুত্রবধূ দৌড়ে ঘরে ঢুকে জানালো—"অতিথি।" "অতিথি"—প্রতিধ্বনির মত বুড়ো বলে উঠল চোখ বড় বড় করে চেয়ে।

আমাকে আরাম করে বসিয়ে বুড়ো তুং হাঁকল, "চা কর"। যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় এরা ঠিক এমনিভাবে অতিথি সৎকার করেছে। যত গরীবই হোক না কেন, চীন পরিবারে যদি এক টিপও চা থাকে তবে সে চা যায় অতিথির জন্যে।

তুং একটা ছোট টুল টেনে এনে আমার পাশে বসল। তারপর কালো ছোট ছোট চোখের ফাঁক দিয়ে চেয়ে চেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় দেখতে লাগল।

বোঝা গেল সব জিনিষ সে আস্তে আস্তে পরখ করে দেখতে ভালবাসে। অবশেষে আমার অস্বস্তি হচ্ছে বুঝে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে দাড়িতে হাত বুলিয়ে সে বলল, "জানো, ঐ শালার কুয়োমিণ্টাংরা শূয়োরের বাচ্ছার অধম। তারা আমাদের বলেছিল ভারতীয়রা ভূতের মত দেখতে। তারা নাকি এত বর্বর যে বুদ্ধ তাদের দেশ থেকে পালিয়ে এসে চীনের ঠাকুর হয়েছিলেন। হায়, হায়। তারা যে আরও কত কী বলত তোমাদের নামে আর কী অত্যাচার চালাত আমাদের বিরুদ্ধে তা যদি জানতে। আমি মুখ্যু মানুষ। ওদের কত কথা যে বিশ্বাস করেছি। দুনিয়ায় ভূতের জাত যদি থাকে তো ঐ কুয়োমিণ্টাং।" নানান বিষয় আলোচনা শুরু হল। আমরা কী খাই না খাই, ওদের সবুজ চা আমাদের লাল চায়ের চেয়ে ভাল লাগে কিনা ইত্যাদি নানা ছোটখাট বিষয়ে কথা উঠল। আমি চায়ের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বললাম যে সবুজ চা আমার চরণামৃতের মত লাগে। সবুজ চা সত্যি ফুল-গোলা গরম জলের মত খেতে। সাধারণভাবে আমার খারাপ লেগেছে। কিন্তু সেকথা এদের বলি কি করে! কথায় কথায় প্রশ্ন করলাম, "আপনার পরিবার কোন্ শ্রেণীর ব'লে ধার্য হয়েছে?" বুড়ো মুখের কথা লুফে নিয়ে চিৎকার করে বলল, "সর্বহারা।" ব'লে ফোকলা মুখে একূল ওকূল ভাসিয়ে হেসে উঠল। চীন বিপ্লব আজ ঐ শ্রেণীকে এমন গর্ব আর সম্মান দিয়েছে। কথাটা বলতেও মানুষের মন গর্বে ভরে ওঠে।

তুং-এর ছেলেটি রেলের মজুর। সমস্ত পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার তার ওপর। বুড়ো মা-বাপ, বউ আর একটি ছোট বোন নিয়ে তার পরিবার। যেহেতু এ পরিবারে চাষ করবার মত সক্ষম লোক নেই এবং উপার্জনের অন্য উপায় আছে, সেজন্যে এরা জমির ভাগ পেয়েছে অনেক কম। সরকার তাদের তিন মু জমি দিয়েছে যাতে তরিতরকারীর চাষ করে এদের সংসারে সাশ্রয় হয়। বুড়ী-মা, বউ সেই জমিতে তরীতরকারীর চাষ করে আর ঝাঁকায় করে তা হাটে বেচতে যায়। প্রত্যেক পরিবারের প্রয়োজন অনুসারে তাকে এমনি কমবেশী জমি দেওয়া হয়েছে।

"ভাবছি অক্ষর শেখার ক্লাশে যাব", তুং সলজ্জ ভাবে বলল, "অক্ষর চেনা শেখা দরকার। নতুন জীবনকে জানতে হবে। হাজার হোক আমি সর্বহারা শ্রেণীর

লোক—আমার এই বিপ্লব ব্যাপারটা জানা দরকার।" দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে তার মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল।

তুং-দের উঠোন পেরিয়ে ওপাশে তার দাদার বাড়ী। তার দাদার অল্প বয়সী মেয়েটি ভূমি-সংস্কার আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী। তাকে দেখলে একটা কচি দেবদারুর কথা মনে পড়ে। মনে হয় বড় হলে মেয়েটার মাথা আকাশে ঠেকবে। তার মায়ের কাঠখোট্টা গড়ন। গালে চাবড়া-বাঁধা মেচেতার দাগ। একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আছে তার ব্যবহারে, কথায়। সে আমার হাত দুটোর চেটোয় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "কি নরম তোমার হাত। সারা জীবন সম্ভবত কলম ছাড়া কিছু ধরোনি এ হাতে। তুমি যদি কেবল জানতে কি করে প্রতিদিন আমাদের হাত শক্ত হয়ে উঠেছে। কি অমানুষিক খাটুনী গেছে আমাদের জীবনভর। কুয়োমিণ্টাং যেন দুঃস্বপ্ন।" তারপর গলার স্বর চড়িয়ে জোর দিয়ে বলল, "আমাদের মুক্তি-ফৌজের মত ফৌজ কখনও হয়নি। ও আমাদের ফৌজ—আমাদের সন্তান। যখন মুক্তি ফৌজ আমাদের গাঁয়ে এল তখন আমরা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলাম। মুক্তি-ফৌজের ক্ষুধার্ত ছেলেদের আমাদের শেষ সম্বল খাবারটুকু দিয়েও আমাদের আশ মেটেনি। আমরা আরও দিতে পারিনি বলে দুঃখু হয়েছে। কুয়োমিণ্টাং শাসনে কেমন ছিলাম জিজ্ঞাসা করছিলে? ওরা আমাদের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়েছিল। আমার বুড়ো—বছরের বেশীর ভাগ দিনই ও কাজের ধাঁধাঁতেই ঘুরে মরত। বাড়ীতে পুরুষরা বেকার তাই মেয়েদের যেতে হত কাজে। আমরা মটরশুঁটি কুড়োতাম, নানা ছুট্‌কো ছাট্‌কা কাজ করে জমিদার বা অবস্থাপন্ন লোকেদের কাছে তা বিক্রি করতাম। নিজেরা না খেয়ে থাকতে পারি কিন্তু বাচ্ছাদের কী দেব? তাই দাসীবৃত্তি থেকে সব করতাম। অনেক সময় বাচ্ছাদের ভিক্ষে করতে পাঠাতাম। অবশ্য যেদিন থেকে কাজে বেরিয়েছি, সেইদিন থেকেই আমাদের ওরা নাম দিয়েছে ভিখিরী পরিবার। আমাদের বাচ্ছারা যখন মরেছে তখন তাদের কবর দেব কি করে ভেবে আকুল হয়েছি। উঃ কী কঠিন জীবন গেছে আমাদের! আর বৃথাই আমাদের হাত শক্ত হয়েছে।"

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতে উঠে দাঁড়ালাম। বুড়ো রাঙা আলু সেদ্ধ

খেয়ে যাবার জন্যে আর একবার পেড়াপীড়ি শুরু করল। মেয়েরা বুকে জড়িয়ে ধরে আদর জুড়েছে। চীনের এই অগণিত সর্বহারা চাষী পরিবারগুলোর একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। তারা যত গরীবই হোক না কেন তাদের মন যত অজ্ঞান আর কুসংস্কারগ্রস্তই হোক না—তারা কথা বলে এক গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা উঁচু করে। 'তারা অতি সাদা-মাটা ভাবে বুঝিয়ে দেয় কেন তারা এই বিপ্লবকে আপনার মনে করে, কেন তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাকে আর স্বপ্ন মনে করে না —বাস্তব বলে স্বীকার করে। এদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায় জীবন সংগ্রামে তারা কী গভীর জ্ঞান লাভ করেছে। তারা যে অধিকার জয় করেছে তাকে বাঁচিয়ে রেখে এগিয়ে নিয়ে যেতে যে শিক্ষা, যে অধ্যবসায়ের দরকার, সে পথ তারা তৈরী করতে শুরু করেছে। তবু মার্কিণ সাংবাদিকরা এবং আমাদের দেশে তাদের ভাড়াটিয়ারা এইসব সাচ্চা, প্রাণবন্ত মানুষগুলোকে "বোকা এশিয়ান চাষা" বলে আখ্যা দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। যারা চাষীদের চিরদিন বোকা বানিয়ে দু'হাতে তাদের লুঠতে চায়, তারা মুক্ত চাষীকে বোকা ব'লে আনন্দ পায় একমাত্র নিজেদের শয়তানিকে চাপা দিতে। শ্বেত-সভ্যতার বাহনেরা! ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। গায়ে কাদা ছুঁড়ে তার গতিরোধ করা যায় না।

"শোন মেয়ে", বিদায় দিতে দিতে তুং-এর বৌদি বললেন, "দেশে গিয়ে আমাদের জীবনের সব কথা ব'লো ওদের। ব'লো মাও টুসি (সভাপতি মাও) আর মুক্তি-ফৌজ আমাদের এ-জীবন দিয়েছে। আমরা মুখ্যু মানুষ, কমিউনিজম্ কি জানি না। কিন্তু এটুকু জানি কমিউনিস্টরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তারা তা প্রমাণ করেছে। বিশেষ করে দেশের মায়েদের কাছে। আমরা বুড়ো মানুষ, কবে আছি কবে নেই, তবু ওরা আমাদের সামনে এগিয়ে নেবার জন্যে কত না চেষ্টা করে। আমরা সবাই গ্রামের চাষী সঙ্ঘের সভ্য হয়েছি। আমাদের আরও অনেক কিছু জানতে হবে। আমাদের সময় অল্প তাই তাড়া করতে হবে সকলকে। লেখাপড়া শেখা একান্ত দরকার। আমাদের গ্রামকে সুন্দর করতে হলে আমাদের লেখাপড়া শিখতে হবে। ব'লো—তোমার দেশে গিয়ে ব'লো—আমরা জীবনকে সুন্দর করতে শিখছি।"

তারপর যত পরিবারে আমি গেছি ঐ এক চিন্তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে—"আমরা জীবনকে সুন্দর করতে শিখছি।"

ফেরার পথে আপিসের উঠোনের কাছাকাছি এসে দেখি তখনও অনেকে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ নতুন পাওয়া ঘোড়ার পিঠে হাত বোলাচ্ছে, কোথাও বা এক কোণে বসে একদল একটা লাঙল পরীক্ষা করছে—সম্ভবত তাদের যৌথ সম্পত্তি। একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। একটা ঘোড়ার গাড়ীর গায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে। গায় তার খাকি পোষাক, মাথায় সে বেশ লম্বা। তার পেছনে সূর্য অস্ত গেছে। গোধূলির লাল আলোর ওপর মাথা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে সে মুগ্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তার ঘাড়টাকে বাঁ-দিকে বাঁকানোর ভঙ্গীতে একটা সবল মাধুর্য। তার লম্বা আঙুলগুলো বর্ষার চারার মত বাড়ন্ত। ছেলেটিকে আশ্চর্য সুন্দর মনে হল। তার মাথা যেন আকাশে ঠেকে আছে—যেন আরও বেড়ে উঠতে চাইছে সে।

কাছে আসতে আশপাশের লোকের চেঁচামিচিতে তার চমক ভাঙল। সারা মুখে একটা সপ্রতিভ প্রশস্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল। আমি কে জানতে চাইল দোভাষীর কাছে। আমি নানা প্রশ্নে তাকে অস্থির করে তুললাম। উত্তরে সে শুধু বলল, "আমার জীবন? তখন আমি এতটুকু। জমিদারের বাড়ীতে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হল। কি করব। বাপ ছিল না। মা আর ছোট বোনটিকে মানুষ করার দায়িত্ব নিতে হল ঐ বয়সেই। দিনে ক'ঘণ্টা খাটতাম জিজ্ঞেস করছ? বাড়ীর জানোয়ারগুলো আমার চেয়ে বিশ্রাম পেত বেশী। তবে আমাদের খাবার বরাদ্দ ছিল এক—সারা বছর ধরে ভূষির রুটি। ভাবছ এমন স্বাস্থ্য হল কি করে আমার? আমিও ভেবে অবাক হই। মানুষের বাঁচার ক্ষমতা কি সাংঘাতিক! তারপর তেরটা বছর কেটেছে। তেরটা বছর।" তার মুঠো শক্ত হয়ে উঠল, "আর সে জীবন নয়। কখনও, কোনদিনও নয়। এখন আমি স্বাধীন। আমি শুধু স্বাধীন নই। আমি ঐশ্বর্যের মালিক। আমি জমি পেয়েছি, একটা বাড়ীও পড়েছে আমার পরিবারের ভাগে। চাষের জিনিষ-পত্র আর একটা ঘোড়ার গাড়ী অন্য দুটি পরিবারের সঙ্গে ভাগে ব্যবহার করি।

শুধু একটা জিনিষ এখনও বাকি আছে।" বলে হেসে কটাক্ষে চেয়ে নিল বন্ধুদের দিকে। "বউ এখনও ঘরে আসেনি। তবে শিগগিরই আসবে। আগে হলে বউ কিনতে হত। আমার মত অবস্থার লোকের বউ কেনার প্রশ্নই উঠত না। এখন বউ কেনা বে-আইনী। মানুষ এখন ভালবাসার বদলে বউ পায়, পয়সার বদলে নয়। এখন মেয়েদের আমরা নিজেদের সমান বলে মানতে শিখছি।" কথা বলতে বলতে সে সোজা হয়ে উঠল, "আমার গাঁয়ের মানুষ আমাকে মুক্ত চীনের চাষী সংগঠনের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করেছে। আমি জনগণের নেতা হওয়াকে গর্ব মনে করি"—একি! ওর মাথাটা যেন গোধূলির আলো পেরিয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে।

রাত নেমে এল। চাষীরা ঘরে ঘরে বাতি জ্বালতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা পরিস্কার বাতাস বুক ভরে নিতে নিতে আমরা কালো আকাশকে পৃথিবীতে নেমে আসতে দেখছি। আজ সেই ছোট্ট এতটুকু একখানা গাঁয়ে মানুষ তার শ্রমের "ফল" জয় করেছে। আজ থেকে ওদের বাড়ীতে বাড়ীতে একটা চিন্তা শুধু স্পন্দিত হচ্ছে—"আমরা জীবনকে সুন্দর করতে শিখছি।" আর এই চিন্তাকে ভিত্তি করে এক দুর্বার শক্তির জন্ম হচ্ছে উ সু-চাং গাঁয়ের প্রতিটি প্রাণীর মনে। আমার চিন্তার প্রতিধ্বনি করে কে একজন ব'লে উঠল, "চীন বিপ্লব দুনিয়ার সামনে যে সম্ভাবনা খুলে দিয়েছে তা বর্ণনা করা অসম্ভব।"

আমরা ফিরে চলেছি। সকলে যে যার চিন্তায় ডুবে আছি। হঠাৎ মনে হল আমার বাঁ হাতের মুঠোয় শক্ত কি যেন রয়েছে। মুঠো খুললাম। দেখি শুকনো মাটি। নীল কুর্তা পরা ছেলেটির দেওয়া সেই "আমাদের সোনার মাটি"…এই কল্যাণী পৃথিবী!

"বসন্তে যারা ধান বুনবে
এসো, এই তো সময়;
সোনার ধান পেটে ধ'রে
কল্যাণী পৃথিবী
আমাদের খাটুনির দাম দেবে।"

—আই চিং

মেয়েরা

"মেয়েদের অধিকার" বলে একটা কথা আমাদের দেশে চালু আছে। কথাটা আছে, অধিকারটা নেই।

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট, আমাদের মেয়েরা নাকি স্বাধীন হয়েছেন। আমরা দুদিনেই হাতে নাতে স্বাধীনতার প্রমাণ পেলাম। এমন কি হিন্দু মেয়েরা বাপের সম্পত্তিতে এই এতটুকু বখরা পাবে কি না আর লম্পট স্বামীকে ছাড়বার অধিকার আছে কিনা, পার্লামেণ্টে এ নিয়েই নাজেহাল হলেন নেতারা। প্রশ্ন করলে উত্তর হল যে, আমাদের নাকি মন্ত্রী থেকে, গবর্ণর থেকে, রাষ্ট্রদূত থেকে আরম্ভ করে ভোটার অবধি মেয়েরা। আর কি চাই!

বটেই তো! ধরুন, আমাদের কোন হিন্দু মহিলা মন্ত্রীর স্বামী লম্পট। এবং তাঁর এমন কি সে স্বামীর সঙ্গে ঘর করায় তীব্র অমত। কিন্তু এই মহীয়সী প্রতাপশালিনী মন্ত্রী সাহেবা কি স্বামীকে ছাড়তে পারবেন? পারবেন না। লম্পটের সঙ্গে তাঁকে "আদর্শ পরিবার" তৈরীর উদাহরণ খাড়া করতে হবে!

আমাদের মেয়েদের এই রাজনৈতিক অধিকারের প্রহসন আরও পরিস্কার ধরা পড়ে যখন আমরা চীনের মেয়েদের মুক্ত জীবনে, মেয়েপুরুষদের সমান অধিকারগুলোকে পরীক্ষা করে দেখি।

চীনা গণরাষ্ট্রের "জনগণের রাজনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের" সাধারণ কর্মসূচীর ৬ নং ধারায় আছে মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণা :

"যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা মেয়েদের শৃঙ্খলিত করেছে, চীনা গণরাষ্ট্র তার অবসান ঘটাবে। মেয়েরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও সামাজিক জীবনে পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করবে। মেয়েপুরুষের স্বাধীন বিবাহের প্রচলন করা হবে।"

রাও বিলের হাঙ্গামা নেই। সে বিল ধামা চাপা দেওয়ার প্রাণপরিত্রাহি চেষ্টার বালাই নেই। সরকার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই চীনের মেয়েদের অধিকারের বনিয়াদ পাকা করা হল।

চীনের জনসাধারণের প্রোগ্রামের এই ধারাটি যে শুধু কাগজের শোভা বর্ধন করতে লাগল তাই নয়, গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কার্যকরী করে তোলার বিপুল আয়োজন করা হল। মূলত তিনটি আইন পাশ করে সরকার চীনের মেয়েদের অধিকার জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করল : ভূমি-সংস্কার, বিবাহ আইন আর শ্রমিক বীমা আইন।

চীনের মেয়েদের ভূমি-সংস্কারের ভিত্তিতে যে অর্থ নৈতিক অধিকার সেটাই তাদের মূলত পায়ের নীচে শক্ত জমি দিয়েছে। সামাজিক উৎপাদনে অংশ গ্রহণই তাকে পুরুষের সঙ্গে সমান আসনে বসিয়েছে। ভূমি-সংস্কার জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করে চাষী পুরুষকে আর চাষী মেয়েকে সমানভাগে জমি বিলিয়েছে বলেই আজ চীনের মেয়েদের কাছে তাদের সামাজিক আর রাজনৈতিক অধিকারগুলো স্পষ্ট আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওদের কেন্দ্রীয় সরকারে অবশ্য মেয়েরা বহু উচ্চপদস্থ কাজ করেন। ওদের দু'জন মেয়ে মন্ত্রী আছেন, গণরাষ্ট্রের সহ-সভানেত্রী হিসেবে আছেন সুং চিং-লিং (মাদাম সুন-ইয়াৎ সেন)। কিন্তু এই পদগুলো ওদের অধিকারের পক্ষে চরম কথা নয়। যেটা চীনা মেয়েদের পক্ষে বড় কথা, সেটা হল যে, ওদের ঘরে ঘরে আজ মুক্ত মেয়ে—যারা গাঁয়ে, শহরে, দপ্তরে, মাঠে প্রতিদিন নেত্রী হিসেবে গড়ে উঠছে। আমাদের দেশে এক আধখানা জেনানা মন্ত্রী-রাষ্ট্রদূত আছেন বটে কিন্তু ঘরে ঘরে আমাদের মেয়েরা শৃঙ্খলিত। যে দেশে মায়েরা আকালের তাড়নায় ছেলে বেচে দিতে বাধ্য হয় সে দেশে মেয়ে রাষ্ট্রদূত ঔপনিবেশিক প্রথায় গলার শোভা হতে পারেন—অধিকারবতী স্বাধীন মেয়ে নন।

এ বইয়ের অন্যান্য অংশে চাষী ও শ্রমিক মেয়েদের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক অধিকারের বিভিন্ন দিক দেখিয়েছি। এ-অংশে বিশেষ করে চীনের নতুন বিবাহ আইন কি ভাবে মেয়েদের সামাজিক বন্ধন চুরমার করে দিয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব।

শুনেছি আমাদের হায়দ্রাবাদের বুড়ো নিজামের পঁয়ষট্টি জন বেগম আছে। আরও জানি বহু জমিদার, নবাব আর সামন্ত রাজাদের ঘরে দাসীবৃত্তি করানোর জন্যে "বিয়ে" করা হয় স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের। পুরনো চীনের সামন্ততান্ত্রিক হর্তাকর্তারা ছিল আমাদের নিজামেরই যেন জাতভাই। আনহুয়েই প্রদেশের ফুইয়াং জেলার জমিদারের ভুমি-সংস্কারের ঠিক আগে অবধি সত্তর জন "বউ" ছিল। লোকটা খেয়াল হলে বউদের উলঙ্গ করে ময়দা পেশাতো। তারপর সে ময়দার খাবার. তৈরী হলে তার নাম দিত "সুন্দরী খাবার।" লোকটা বলত, "দিনমজুর ভাড়া করে খাটানোর চেয়ে বউ পোষা অনেক শস্তা। বউরা মজুরী ছাড়াই কঠিন পরিশ্রম করে।"—মাতৃজাতি সম্বন্ধে আজকের দিনে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার এই হল চরম সম্মানের কথা!

গত কয়েক হাজার বছর ধরে চীনের অগণিত মানুষ তাদের সমাজের বর্বর বিবাহ নীতির হাতে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে। পুরুষ বা মেয়ে কারুরই স্বাধীন বিবাহের রীতি ছিল না। কিন্তু মেয়েদেরই সব ক্ষেত্রে বেশী অত্যাচার সহ্য করতে হত—কারণ, পুরুষদের "স্ত্রীত্যাগের সাত ধারা"র সাহায্যে বউকে ছেড়ে যাবার নিয়ম ছিল। মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হত—"বিয়ে করা বউ হল কেনা ঘোড়ার মত। ইচ্ছে মত তাকে চড়ো কিম্বা মারো।" ওদের পুরাণে মেয়েদের অধিকারের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদের অধিকারের হুবহু মিল দেখা যায়। জীবনে তিনটি অধীনতা মেয়েদের স্বীকার করতে হত—"বিয়ের আগে বাপকে মানবে, বিয়ের পরে স্বামীকে মানবে আর স্বামী মারা যাবার পর ছেলেকে মানবে।"

পুরনো চীনে বিয়ের ব্যাপারে যে সমস্ত কুসংস্কার ছিল, তার মধ্যে খুব মারাত্মক হল ওদের পয়সা দিয়ে বউ কেনার নিয়ম। গরীব চাষীদের অনেক ক্ষেত্রে জীবনভর অবিবাহিত থাকতে হত। যাদের এক ফালি জমি অবধি নেই, তারা বউ কিনবে কী দিয়ে! তাই দেখা গেল অনেক জায়গায় ভূমি-সংস্কারের পরেও কিছু কিছু চাষী জমি বেচে বউ কিনেছে। যেহেতু ভূমি-সংস্কারের পরও বেশ কিছুদিন পুরনো বিবাহব্যবস্থা কায়েম ছিল এবং দেশ জুড়ে নতুন বিবাহ নীতি

ভালভাবে প্রচারিত আর কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি—সেইজন্যে ভূমি-সংস্কার করেও অনেক সময় চাষীর জমির সমস্যা মোচন সম্ভব হচ্ছিল না।

চীনের বিবাহ আইন তার সামাজিক জীবনে এক সুন্দর সুস্থ অধ্যায় খুলে ধরেছে। এখন আর পয়সায় দিয়ে বউ পরিমাপ হয় না। স্ত্রীপুরুষের স্বাধীন ভালবাসার ভিত্তিতে স্বাভাবিক বিবাহের প্রচলন হয়েছে। বিবাহ যেমনি স্বাধীন, তেমনি যদি কোন কারণে সেই বিবাহ সুস্থ পারিবারিক জীবন গড়ার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকারও উভয়পক্ষের আছে। সন্তান পালনের দায়িত্ব বাপ মা-কে সমান ভাগে নেওয়ায় ব্যাপারে আইনে বাধ্য করা হয়েছে। আগে যেমন অসহায় স্ত্রীকে সন্তানসহ ছেড়ে যাওয়াকে স্বাভাবিক বলে ধরা হত এখন আর তা সম্ভব নয়। জাতির ভবিষ্যত যে শিশু, তাকে অবহেলা করবার অধিকার নতুন চীনের কোন অধিবাসীর নেই।

চীনের মেয়েদের জীবনে এই সমস্ত যুগান্তকারী বদলের ফলে তাদের সঞ্জীবনী শক্তি আশ্চর্য রকম বেড়ে গেছে। হোনান প্রদেশে নতুন সমাজ গড়ার কাজে মেয়েরা এত অগ্রণী হয়েছে যে, তার মাত্র একটা অংশে ১৩টি বিভাগে এক হাজার মহিলা কর্মী সরকারী কাজের ভারপ্রাপ্তা। সিংকিয়াং-এর মত পশ্চাৎপদ প্রদেশে মেয়েদের মধ্যে এমন সাড়া জেগেছে যে তাদের বিভিন্ন জেলা আর কেন্দ্রীয় সরকারে পাঁচশো মেয়ে কাজ করছেন। এদের হোচিং এলাকার সরকারী দপ্তরের সচিব হলেন একজন মোঙ্গল মেয়ে।

সাড়ে ছয় লক্ষ মেয়ে চীনের কলকারখানায় আজ পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে কাজ করছে। এর মধ্যে অনেকে বিভিন্ন কলকারখানার বিভাগীয় ম্যানেজার বা ডিরেক্টার পদ অর্জন করেছেন। এমন কি পিকিং-এর রাস্তায় আজ মেয়েরা ট্রাম চালাচ্ছে, পিয়নের কাজ করছে। উত্তর চীনে হারবিন, পোর্ট-আর্থার, ডাইরেন প্রভৃতি জায়গায় মেয়েরা এত এগিয়ে গেছে যে, সেখানে একটা ট্রেনের চালক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কর্মীই মেয়ে। চীনের দেশজোড়া "উৎপাদন বাড়াও" আন্দোলনে এসব অঞ্চলের শতকরা ৯৫ জন মেয়ে যোগ দিয়েছে।

মেয়েদের পড়াশুনো করার প্রয়োজনীয়তাকে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেওয়া

হয়। চীনের চাষী-মজুর মেয়েরা পুরনো চীনে প্রায় শতকরা একশো ভাগ নিরক্ষর ছিল। এখন মেয়েদের জন্যে বিশেষ পাঠচক্রের আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে। টিয়েনসিনে মেয়ে-মজুরদের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর জন দেখলাম "নিরক্ষরতা দূরীকরণের পাঠচক্রের" সভ্য। শানসী প্রদেশে এক কোটি দু লক্ষ মেয়েপুরুষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ যোগ দিয়েছে লেখাপড়া শেখার গ্রুপগুলোয়। চাষী মেয়েদের জন্যে শীতের বিশেষ পাঠচক্রের প্রোগ্রাম নেওয়া হয় কারণ এসময়ে ক্ষেতের কাজ না থাকায় পড়াশুনোর জন্যে বেশী সময় দিতে পারে মেয়েরা।

চীনের মজুর মেয়েরা আজ "সমান কাজে সমান মজুরী" পায়। ভারতবর্ষের মত পুরনো চীনও ছিল আকালের দেশ। আকালের দিন চীনের বুক থেকে চিরদিনের মত মুছে ফেলা হয়েছে। এ কাজে চীনের মা ও মেয়েদের দান খুব বেশী। ১৯৪৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশে যখন দশ কোটি "মু" আবাদী জমি (প্রায় পাঁচ কোটি বিঘার মত) বন্যার জলে ভেসে গেল, তখন মেয়েরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন ফসল বাঁচাবার কাজে। তিনলক্ষ মেয়ে পুরুষ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে। বন্যার জল কেটে বের করে দেওয়া হল। দিনরাত বুকজলে দাঁড়িয়ে চীনের মায়েরা সেদিন যে ফসল বাঁচালেন তার কিছু অংশের ভাগ পেয়েছি আমরা। এইসব মায়েরা সেদিন শুধু নিজেদের দেশ থেকে দুর্ভিক্ষ তাড়াবার পথ করলেন তাই নয়, আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধেও লড়বার রসদ জোগাবার বন্দোবস্ত তাঁরা করলেন। তাই যখন মার্কিণ কাগজগুলোকে প্রতিধ্বনিত করে আমাদের কাগজে প্রবন্ধ বার হয় যে, চীনে দুর্ভিক্ষ থাকা সত্ত্বেও তারা লোক দেখানোর জন্যে ভারতবর্ষে চাল পাঠাচ্ছে, তখন অসম্ভব ঘৃণা হয় এই সব নিমকহারাম মিথ্যাপ্রচারকারীদের ওপর।

পিকিং-এ থাকতে এই সব চাষী-মজুর মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। যারা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কাজে অগ্রণী, তাদের মধ্যে অনেকের কাছে বারবার আমাদের দেশের মা ও মেয়েদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। তাদের বুকে আঁটা পদকগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতাম। নেশা লাগত। মনে হত আমার মনের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আর গর্ব যেন ওদের বুকে পদক হয়ে ঝুলছে।

চীনের গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা আনার কাজে সবচেয়ে অগ্রণী। আমরা যখন পিকিং-এ, তখনই এই ফেডারেশনের সভ্য সংখ্যা তিন কোটির ওপর। এই প্রতিষ্ঠান আজ শুধু চীনের নয়, বিশ্ব-গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনের গর্ব। এদের সভানেত্রী মাদাম চাই-চাংএর অমায়িক আর বিনয়ী ব্যবহার দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, ছোট্টখাট্টো মানুষটার জীবন একটা ইস্পাতের ফলার মত বছরের পর বছর চীনের মেয়েদের পায়ের শৃঙ্খল কেটেছে।

চীনের মায়েরা আজ এক দিগদিগন্ত জোড়া ভবিষ্যৎকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে। তাদের এই ভবিষ্যতের ছবি আঁকার কেন্দ্রে রয়েছে তাদের শিশুরা—জীবন সৃষ্টি আর জীবনরক্ষার পবিত্র দায়িত্বকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবার জন্য এরা এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলেছে।

চীনের শিশুরা এক অদ্ভুত স্মৃতি রেখে গেছে আমার মনে। পৃথিবীতে এত শিশু দেখেছি, এত সুন্দর লেগেছে তাদের, কিন্তু চীনের শিশুদের মত মনকে তারা এমন ভাবে নাড়া দিতে পারেনি অন্য কোথাও। বোধ করি চীনের শিশুরাষ্ট্রের সঙ্গে মিশিয়ে এ শিশুদের দেখেছি বলেই।

কল্পনা করুন ননীর মত রঙের আগাগোড়া গোল দেড় ফুট লম্বা একটা মানুষ। তার আপেলের মত টোল খাওয়া গালের চারধারে মিশকালো চুল ঘিরে আছে। তার ছোট্ট লাল ঠোঁটের হাসির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে দু'জোড়া দাঁত: কি আশ্চর্য সুন্দর সেই হাসি! আর কল্পনা করুন তার পাশে কলকাতার কাশীপুর উদ্বাস্তু শিবিরের দম আটকে মরা শিশুদের মুখ! কল্পনা করুন ঘরে ঘরে এই সব কঙ্কালসার শিশুদের মুখ দেখে যে মায়ের বুকে হাহাকার ওঠে, সেসব মায়ের কাছে নতুন চীনের ননীর মত শিশুরা কি দুর্বার আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভালবাসার ঝড় বওয়ায়।

চীনে যত মিটিং-এ গিয়েছি তার মধ্যে আমার সব চেয়ে আকর্ষণীয় লেগেছিল পিকিং প্রাথমিক ইস্কুলের এক হাজার শিশুর এক মিটিং। সেদিন ভীষণ শীত। মোটা গরম জামা পরা গুঁড়ি গুঁড়ি এক হাজার বাচ্চা ইস্কুলের খেলার খোলা মাঠে

জমা হয়েছে। ইস্কুলের কিশোর সংগঠনের নেতা (সে-সময়ে সারা চীনে এদের সভ্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ হতে চলেছে), ন বছরের একটি মিষ্টি ছেলে বক্তৃতা শুরু করল। তার বক্তৃতার পদ্ধতি চমৎকার। সে যেই বলে, "বন্ধুগণ! আমাদের বিদেশী মায়েরা আমাদের কাছে এসেছেন আমাদের দেখতে, আমাদের দেশকে ভালবাসেন বলেই—নয় কি?" অমনি সমস্ত বাচ্ছারা হৈ হৈ করে সায় দিয়ে ওঠে—"নিশ্চয়, নিশ্চয়।" তখন আবার সে শুরু করে—"আমাদের বাপ-মা আমাদের নতুন চীন দিয়েছে। আমরা খুব ভাল করে পড়াশুনো করে তাদের খুসী করব—নয় কি?"—রব ওঠে, "আলবৎ, আলবৎ।" আমি অবাক হচ্ছিলাম এতটুকু বাচ্ছাদের বক্তৃতা শোনার আগ্রহ দেখে। আমি যখন বললাম, "ভারতবর্ষের মায়েরাও তাদের বাচ্ছাদের জন্যে নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলবার জন্যে লড়াই করছে—," তখন সারা জায়গাটা জুড়ে অন্তত পাঁচ মিনিট ধরে ওরা বই, খাতা, রুমাল, টুপি উড়িয়ে মিষ্টি গলায় ভারতবর্ষের মায়েদের সম্বর্ধনা জানাল। একটু পরেই শুরু হল নাচগান। অবাক হয়ে দেখলাম চার বছর বয়েসের এক পুতুলের মত মেয়ে, চার থেকে ছ বছরের গোটা দশেক বাচ্ছার এক কন্‌সার্টের নেতৃত্ব করছে। তার হাবভাব দেখলে মনে হবে সে জন্মে অবধি বাজিয়ে। নির্ভুল সুরে ওরা নাচের সুর বাজাচ্ছিল নানা দেশীয় যন্ত্রে। শুনলাম পিকিং রেডিওতে এরা প্রোগ্রাম দেয়!

যেদিন চলে আসি গুঁড়ো গুঁড়ো বাচ্ছারা মায়েদের হাত ধরে আমাদের ফুল দিতে এসেছিল। তারা এত ছোট যে তখনও কথার আড় ভাঙেনি। বেশী জোরে হাঁটতে গেলে টলে পড়ে। কিন্তু উৎসাহ দেখলে অবাক হতে হয়। ওরা "ইয়াঙ্কো" নাচবেই। এক হাতে ফুল নিয়ে অন্য হাতে মোটা গোল আঙুলে রুমাল দুলিয়ে ওরা নাচছে।

ওরা আধো স্বরে গাইছে "ভিন্‌দেশী মা আমার, কত লম্বা ট্রেণে করে এসেছ আমার দেশে, আমায় দেখতে। ভিন্‌দেশী মা, এই নাও ফুল, তোমার কাজের চাপের কষ্ট কমবে এতে।"

একটি বাচ্ছাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ছিলাম। তার গানে নতুন জীবনের কলতান। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার ভেসে যাওয়া দু'চোখের জল কচি আঙুল দিয়ে মুছতে মুছতে হেসেছিল—আশ্চর্য সুন্দর সেই হাসি।

চীনের বিবাহ বিধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধারণ মূলসূত্র

১ নং ধারা—মেয়েদের ওপর পুরুষদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও সন্তানদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন অযৌক্তিক ও বাধ্যতামূলক সামন্ততান্ত্রিক বিবাহ পদ্ধতি বাতিল করা হ'ল।

সঙ্গী বাছাই করবার স্বাধীনতা, একবিবাহ, মেয়েপুরুষের সমান অধিকার এবং নারী ও সন্তানের আইনগত স্বার্থরক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন গণতান্ত্রিক বিবাহ-বিধি কার্যকরী হবে।

২ নং ধারা—বিধবা বিবাহে বাধা দান, বিবাহ ব্যাপারে পণ অথবা যৌতুক আদায়, বহুবিবাহ, উপপত্নী গ্রহণ, শৈশবে বাগ্‌দান নিষিদ্ধ ব'লে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ চুক্তি

৩ নং ধারা—পাত্রপাত্রী দুজনেরই পুরোপুরি মত থাকলে তবেই বিয়ে হবে। কোন পক্ষই জোরজার করতে পারবে না এবং কোন তৃতীয় পক্ষ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৪ নং ধারা—পাত্রের বয়স ২০ বছর এবং পাত্রীর বয়স ১৮ বছর হ'লে তবেই তারা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

৫ নং ধারা—নিচে যেসব ক্ষেত্রের কথা বলা হ'ল, সেইসব ক্ষেত্রে কোন মেয়ে অথবা কোন পুরুষ পরস্পরকে বিয়ে করতে পারবে না :

(ক) মেয়ে ও পুরুষ দুজনে যদি একই বংশের হন ও পরস্পরের মধ্যে যদি রক্তের সম্পর্ক থাকে, কিম্বা দুজনে যদি একই বাপমা-র সন্তান হন। কিম্বা যদি একজন আরেকজনের সৎভাই ও সৎবোন হন। যেক্ষেত্রে সগোত্র-আত্মীয়তা পঞ্চম পর্যায়ের মধ্যে পড়ে, সেক্ষেত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করার প্রশ্নটি প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী স্থির করা হবে।

(খ) যেক্ষেত্রে শারীরিক বৈকল্যের দরুণ একপক্ষ যৌনসম্পর্কের দিক থেকে অপারগ।

(গ) যেক্ষেত্রে কোন পক্ষ উপদংশ, উন্মাদরোগ, কুষ্ঠ বা এমন কোন রোগে আক্রান্ত, যার দরুণ চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী তিনি বিবাহের অযোগ্য।

৬ নং ধারা—পাত্রপাত্রী যেখানে বাস করেন, সেই এলাকার বা গণ-সরকারের কাছে নিজেরা হাজির হয়ে রেজিস্টারি ক'রে বিবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে। যদি দেখা যায় এই আইনে যেসব বিধান দেওয়া আছে, সেই অনুযায়ী বিবাহ হচ্ছে তাহ'লে স্থানীয় গণ-সরকার অবিলম্বে বিবাহ সার্টিফিকেট দেবার ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু যদি দেখা যায় বিবাহের ফলে এই আইনের বিধানগুলি ভঙ্গ হচ্ছে, তাহ'লে রেজিস্টারি মঞ্জুর করা হবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বামী স্ত্রীর অধিকার ও কর্তব্য

৭ নং ধারা—স্বামী স্ত্রী একত্রে সঙ্গী হিসেবে বাস করবেন এবং ঘর সংসারে তাঁরা সমান অধিকার ভোগ করবেন।

৮ নং ধারা—স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে, সাহায্য ও দেখাশুনা করতে, মিলেমিশে বাস করতে, উৎপাদনের কাজে লাগতে, সন্তানদের যত্ন করতে এবং সংসারের ভালোর জন্যে একত্রে চেষ্টা করতে এবং নতুন সমাজ গড়ে তুলতে কর্তব্যের দিক থেকে বাধ্য থাকবেন।

৯ নং ধারা—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিজের নিজের পছন্দমত বৃত্তি গ্রহণ

করতে পারবেন এবং স্বাধীনভাবে কাজকর্মে ও সামাজিক ব্যাপারে অংশ নিতে পারবেন।

১০ নং ধারা—পারিবারিক সম্পত্তি ভোগদখল ও তদারক করার ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সমান অধিকার থাকবে।

১১ নং ধারা—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই তাঁদের নিজের পরিবারের পদবী ব্যবহার করতে পারবেন।

১২ নং ধারা—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাপ-মা ও সন্তানের সম্পর্ক

১৩ নং ধারা—সন্তানদের লালন পালন ও শিক্ষা দেওয়া বাপ-মার কর্তব্য ; বাপ-মাকে দেখাশুনা করা ও সাহায্য করা সন্তানদের কর্তব্য। বাপ-মা অথবা সন্তান কেউই কারো প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না বা কেউ কাউকে ত্যাগ করবে না।

সৎ-বাপ মা এবং সৎ-ছেলেপুলেদের বেলাতেও উপরোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। শিশুসন্তানদের জলে ডুবিয়ে মারা এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ কড়াভাবে নিষিদ্ধ হবে।

১৪ নং ধারা—বাপমা ও সন্তানেরা পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন।

১৫ নং ধারা—বিবাহবন্ধনের বাইরে যে সন্তানদের জন্ম, তারা আইনত বিবাহবন্ধনের মধ্যে জন্মানো সন্তানদের সঙ্গে সমান অধিকার পাবে। বিবাহ বন্ধনের বাইরে যে সন্তানদের জন্ম হয়েছে, তাদের ক্ষতি কিম্বা তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার কেউই করতে পারবে না।

বিবাহ-গণ্ডীর বাইরে জন্মানো শিশুর পিতা ঠিক কে, তা শিশুর মা বা অন্যান্য সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে আইনত প্রমাণ হবার পর শিশুর ১৮ বছর বয়স অতিক্রম

না করা পর্যন্ত উক্ত শিশুর পিতা তার ভরণপোষণের পুরোপুরি বা আংশিক খরচ বহন করবেন।

প্রকৃত মা-র সম্মতি নিয়ে প্রকৃত পিতা শিশুকে নিজের কাছে রাখতে পারেন।

শিশুটির প্রকৃত মা যদি বিয়ে করেন, তাহলে তার ভরণপোষণের ব্যাপার ২২ নং ধারা অনুযায়ী হবে।

১৬ নং ধারা—আগেকার বিয়েতে যে সন্তানদের জন্ম হয়েছে, তাদের প্রতি স্বামী বা স্ত্রী দুর্ব্যবহার করতে পারবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-বিচ্ছেদ

১৭নং ধারা—স্বামী স্ত্রী দুজনেরই ইচ্ছে থাকলে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা হবে। যদি শুধু স্বামী বা শুধু স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করে এবং যদি এলাকার গণ-সরকার এবং বিচার প্রতিষ্ঠানের মিটমাটের চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা হবে।

যে সব ক্ষেত্রে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদে ইচ্ছুক, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের সার্টিফিকেট এলাকার গণ-সরকারের কাছে পাবার জন্যে রেজিস্টারি করতে হবে। এলাকার সরকার যখন এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হবেন যে, উভয় পক্ষই বিচ্ছেদ চান এবং সন্তান ও সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তখন অবিলম্বে বিচ্ছেদের সার্টিফিকেট মঞ্জুর করতে হবে।

যদি শুধুমাত্র এক পক্ষই বিচ্ছেদ চান, তাহলে এলাকার গণ-সরকার মিটমাটের চেষ্টা করতে পারে। আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হলে মীমাংসার জন্যে ব্যাপারটিরকে তারা জেলার বা শহরের জনগণের আদালতে পাঠাবে। কোন পক্ষ যদি জেলার বা শহরের জনগণের আদালতে আপীল করতে চান, তাহ'লে কেউ কোন বাধা দিতে পারবে না। বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার ব্যাপারে জেলার বা শহরের জনগণের আদালতের প্রধান চেষ্টা হবে দুপক্ষের মধ্যে একটা মিটমাট করবার, আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হলে আদালত অবিলম্বে রায় দেবে।

যে ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আবার বিবাহ-সম্বন্ধ ফিরিয়ে পেতে চান, সে ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে এলাকার জনগণের সরকারের কাছে পুনর্বিবাহ রেজিস্টারি করবার জন্যে দরখাস্ত করতে হবে। এলাকার জনগণের সরকার এই দরখাস্ত গ্রহণ করবে ও পুনর্বিবাহের সার্টিফিকেট মঞ্জুর করবে।

১৮ নং ধারা—স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা, তখন স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করতে পারবেন না। সন্তান জন্মাবার এক বছর পরে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের এই বিধিনিষেধ খাটবে না।

১৯ নং ধারা—বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় যিনি তাঁর পরিবারের সঙ্গে চিঠিপত্র মারফৎ যোগাযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর স্ত্রী বা স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন করতে চাইলে আগে তাঁকে তাঁর স্বামী বা স্ত্রীর সম্মতি পেতে হবে।

এই আইন জারী হবার তারিখ থেকে শুরু করে পরবর্তী দুবছরের মধ্যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীর কোন সভ্য যদি তাঁর পরিবারের কাছে কোন চিঠিপত্র না দেন, তাহলে তাঁর স্ত্রী বা স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ পেতে পারেন। এই আইন জারী হবার দুবছর আগে থেকে শুরু ক'রে আইন জারী হবার এক বছর পর পর্যন্ত যদি বিপ্লবী সেনাবাহিনীর কোন সভ্য তাঁর পরিবারের কাছে চিঠিপত্র না লেখেন, তাঁর স্ত্রী বা স্বামী বিবাহবিচ্ছেদ পেতে পারেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সন্তানদের খোর-পোষ ও শিক্ষার ভার

২০ নং ধারা—বাপ-মার বিবাহ-বিচ্ছেদ হলেও বাপ-মার সঙ্গে সন্তানদের রক্তের সম্পর্ক চুকে যাবে না। সন্তানদের অভিভাবক মা কিম্বা বাবা যিনিই হোন, তারা হবে উভয় পক্ষেরই সন্তান।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বাপ-মা দুজনেরই কর্তব্য হ'ল সন্তানদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ভার নেওয়া।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মার কাছে রাখাই মূলনীতি হবে।

শিশু বড় হবার পর তার অভিভাবক নিয়ে বাপমার মধ্যে বিরোধ হ'লে এবং কোন আপোষে আসা সম্ভব না হ'লে জনগণের আদালত শিশুর স্বার্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবে।

২১ নং ধারা—বিবাহ-বিচ্ছেদের পর শিশুকে যদি মার কাছে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে শিশুটির ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্যে যে খরচ তা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে শিশুর বাবাকেই গ্রহণ করতে হবে। ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্যে কত খরচ হবে ও কতদিন লাগবে, সে বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা চুক্তি করা দরকার। যদি দুপক্ষের চুক্তি সম্ভব না হয়, তাহ'লে জনগণের আদালতই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবে।

নগদ টাকায় কিম্বা জিনিষপত্রে অথবা শিশুর জন্যে নির্দিষ্ট জমির চাষ থেকে এই খরচ ওঠানো হবে।

বাবা বা মাকে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানোর অনুরোধ জানাবার ব্যাপারে শিশুটির পক্ষে তার ভরণপোষণ এবং শিক্ষা সম্বন্ধে বাপ-মার এই চুক্তি বাধাস্বরূপ হবে না।

২২ নং ধারা—বিবাহবিচ্ছেদের পর মেয়েটি যদি আবার বিয়ে করেন এবং তাঁর স্বামী যদি মেয়েটির আগের পক্ষের সন্তান বা সন্তানদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয় বহন করতে রাজী হন, তাহলে অবস্থা অনুসারে সেই সন্তান বা সন্তানদের বাবা তাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার খরচ কম দিতে বা খরচের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সম্পত্তি ও খোরপোষ

২৩ নং ধারা—বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে, মেয়েটির বিয়ের আগে যে সম্পত্তি ছিল, তার ওপর তার অধিকার থাকবে। অন্যান্য পারিবারিক সম্পত্তির কিভাবে বিলিব্যবস্থা হবে তা দু পক্ষের চুক্তির ওপর নির্ভর করবে। চুক্তি সম্ভব না হ'লে পারিবারিক সম্পত্তির প্রকৃত অবস্থা, স্ত্রী এবং শিশু বা শিশুদের স্বার্থ এবং উৎপাদনের

পক্ষে যা কল্যাণকর হবে, সেই অনুযায়ী জনগণের আদালত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে।

যে সব ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভাগের সম্পত্তি শিশু বা শিশুদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যয় বহন করবার পক্ষে পর্যাপ্ত, সে সব ক্ষেত্রে শিশুদের ভরণপোষণ ও শিশুর খরচ দেবার হাত থেকে স্বামী নিস্কৃতি পেতে পারেন।

২৪ নং ধারা—বিবাহিত জীবনের সময় যে ঋণ হয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর ঐ সময়কার অর্জিত সম্পত্তি থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের পর তা শোধ দেওয়া যাবে। যে ক্ষেত্রে এরকম কোন সম্পত্তি অর্জিত হয়নি কিম্বা ধার শোধ করবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে দেনা শোধ করবার দায়িত্ব হবে স্বামীর। স্বামী বা স্ত্রী আলাদাভাবে নিজেরা যা ধার-দেনা করেছেন, তা তাঁদের আলাদাভাবেই শোধ দিতে হবে।

২৫ নং ধারা—বিবাহ-বিচ্ছেদের পর কোন এক পক্ষ যদি আর বিয়ে না করেন এবং ভরণপোষণের ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন, তাহলে অন্য পক্ষ তাঁকে সাহায্য করবেন। এই সাহায্যের সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি হবে। চুক্তি যে ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে জনগণের আদালত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উপবিধি

২৬ নং ধারা—যাঁরা এই আইন লঙ্ঘন করবেন, আইন অনুযায়ী তাঁরা সাজা পাবেন। যে সব ক্ষেত্রে বিবাহের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা খুনজখম পর্যন্ত গড়াবে, সে সব ক্ষেত্রে যাঁরা এইভাবে হস্তক্ষেপ করবেন তাঁদের ফৌজদারী আসামী হিসেবে সোপর্দ করা হবে।

২৭ নং ধারা—এই আইন জারী হবার দিন থেকেই আইনটি কার্যকরী হবে। যে সব অঞ্চলে জাতীয় সংখ্যালঘুদের বাস, সেসব অঞ্চলে শাসন-এলাকাভুক্ত স্থানীয় জনগণের সরকার (অথবা সামরিক ও রাজনৈতিক পরিষদ) কিম্বা

প্রাদেশিক জনগণের সরকার জাতীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-সংক্রান্ত অবস্থা বিচার করে সেইমত এই আইনে কিছু কিছু অদলবদল বা নতুন ক'রে কিছু যোগ করতে পারবেন। কিন্তু সে সব ব্যবস্থা চালু করার আগে সরকারী শাসন পরিষদের কাছে অনুমোদনের জন্যে আগে পাঠাতে হবে।

চীনের আন্নাকালী

বাংলা দেশে "বৌয়ের আবার মেয়ে হয়েছে" কথাটা যেমন আর্তনাদের মত শোনায় মেয়েদের আত্মীয়স্বজনের মুখে, হুবহু তেমনি শোনাত কুয়োমিনটাঙ চীনে। বাংলার অগণিত আন্নাকালীকে ষাট বছরের বুড়োর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গরীব বাপ-মা যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে "মেয়েটার হিল্লে হল", তেমনি কুওমিণ্টাঙ চীনেও শিশু বয়সে মেয়েকে বিক্রি করে—অসহায় বাপ-মা সমাজের নিয়ম রক্ষা করত। সাম্রাজ্যবাদের পোষা সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জাতির অর্ধেক মানুষের শুভ জন্মক্ষণে ঘরে ঘরে হাহাকার ওঠে। চীনে তিরিশ বছরের কঠোর সংগ্রামে সেই ক্ষয়িষ্ণু গলিত সমাজব্যবস্থাকে চুরমার করে ভেঙেছে চীনের বিপ্লবী মানুষ তার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। সেখানে তাই মেয়েরা আজ যুক্ত। জাতির অর্ধেকের শুভ জন্মক্ষণে হাহাকার তোলার কলঙ্ক থেকে চীনকে যুক্ত করেছে যে মহাবিপ্লব, সেই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাও সে-তুঙের উদ্দেশে তাই ঘরে ঘরে আজ পঁচিশ কোটি মুক্ত মেয়ে গান লেখে আর গান গায়ঃ

"পুরনো সমাজে যেন ছিলাম গভীর অন্ধকূপে,
কখনও দেখিনি সূর্য আর আকাশ
শুধু ছিল অগুন্তি দিন, মাস, বছর—
জন্তুর মত অবুঝ একটানা খাটা
চারিদিকে ঘিরে ছিল শুধু ব্যথা।
কে? কে বাঁচাবে আমাদের?
কত বছর, কতশত জীবনভর অপেক্ষা করেছি—
কে? বাঁচাবে আমাদের কে?
এমন সময়—

কমিউনিস্ট পার্টি আর মাও সে-তুং
সোনার এই ভবিষ্যতে টেনে আনলেন আমাদের।

সোনার ভবিষ্যতে টেনে আনা এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল পিকিঙে। তিনি চীনের আন্নাকালী কাং কা-চিং। তাঁর জীবন-কাহিনী শুরু করার আগে তিনি বার বার বললেন, "আমার জীবনে অসাধারণত্ব খুঁজো না। আমি অতি সাধারণ, শতকরা নিরানব্বই জন মেযের মতই।" জীবন-কাহিনী শেষ হতে বুঝেছিলাম চীনের এই সব সাধারণ মেয়ে-পুরুষের জীবন দিয়েই গড়া চীনের অসামান্য গণবিপ্লব।

কিয়াংসি প্রদেশের উ ফান-ওয়ান গ্রামে এক জেলের ভাঙা কুঁড়েতে সেদিন বড় দুঃখের দিন। "বৌয়ের আবার মেয়ে হয়েছে—"মুষড়ে-পড়া জেলের মুখে কথা নেই। শুধু তার চোখ দুটো যেন অভিযোগ করে স্ত্রীকে বলছে—"আমার প্রতি এ অন্যায় তুমি কেন করলে?" অবুঝ একফোঁটা মেয়েটা মায়ের কোলের কাছটাতে একটু জায়গা খুঁজতে বিদ্রোহীর মত চেঁচাচ্ছে—"ওঁয়া-ওঁয়া-ওঁয়া।" করুণ ভগ্নস্বাস্থ্য মা, অপরাধীর মত মেয়েকে বুকে চেপে ধরে বলছে—"চুপ্, চুপ্। চুপ্. অভাগী মেয়ে।"

গরীব জেলে। দিন আনে দিন খায়। মেয়েকে ঘরে রাখার সংস্থান তার নেই। ছেলে হলে না হয় কথা ছিল। নিজে না খেয়ে ঘরে রাখত। ছেলে বিক্রি করা চলে না, কেননা তারা ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তি; মেয়েরা বোঝা—বাড়তি পেট। সপ্তম মেয়েকে কোন আহাম্মুকেও ঘরে রাখবে না। তাই চল্লিশ দিনের একরত্তি মেয়েটাকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে বিক্রি করে দিতে হল। আগে এমনি ভাবে গেছে পাঁচটি মেয়ে।

কোলের ছেলেটা মারা যেতে এক গরীব চাষী দম্পতি চল্লিশ দিনের শিশু কাং কা-চিংকে কেনে এই ভরসায় যে আবার এক ছেলে হলে মেয়েটাকে তার বৌ করে নেবে। এমনি ছিল নিয়ম। অগণিত কচি মেয়েরা ঘর হারিয়ে "বালিকা-বধূ" হয়ে জীবন কাটাত। চিরদিন তাদের পরিচয় ছিল, "তুং-এর বৌ" বা "চাং-এর বৌ" বলে। নিজের নাম অবধি মনে থাকত না অনেকের।

কিন্তু কপাল ভালো, তাই সেই দম্পতির পর পর দুটি মেয়ে হয়ে মারা গেল। স্বামীহীন বালিকা-বধূ কাং কা-চিং দুঃখী পরিবারে উদয়াস্ত খেটে বড় হতে লাগল। সকালে উঠে গরু বাছুরদের জাব দেওয়া, তাদের মাঠে চরাতে নিয়ে যাওয়া, ঘুঁটে দেওয়া, ঘর নিকোন, কুয়ো থেকে জল তুলে আনা—এক কথায় তার ছোট্ট হাত দুখানার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁচবার সংস্থান করতে হত। কিন্তু এত কাজের চাপেও তার দুঃখ ছিল না বিশেষ। যেন বাঁচবার ইচ্ছের জোরই তার ছোট্ট শরীরটায় ছিল লোহার মত শক্তি। অন্য বালিকা-বধূদের মত তাকে সামান্য দোষে চাবুক খেতে হত না। আর তা ছাড়া গরু চরাতে নিয়ে যাবার সময়, বাইরে এক বিরাট দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছিল তার। এই খোলা দুনিয়ার সঙ্গে—আলোর সঙ্গে রোজ দেখা হওয়াটা কাং কা-চিং বিলাসিতা ব'লে মনে করত—ঠাণ্ডা শীতের সকালেও, বিরক্তিকর গরু বাছুরের ডাক আর গুঁতোগুঁতির ভিড়েও।

কিন্তু বেশীদিন টিঁকলো না এ খোলা দুনিয়া দেখার সুখ। তেরো বছরে পা দিতেই আকাশ দেখার অধিকার ঘুচল তার। এবার শুধু ঘরের কাজের বোঝা। লোকে বলত বয়সের গাছ পাথর নেই ওর! তেরো বছরের কাং কা-চিং তাই দড়ির জুতো আর তক্‌লি সুতো কাটার ফাঁকে ফাঁকে কী এক অজানা চিন্তায় কাতর হতে লাগল।

"সে সময়", কাং কা-চিং তার কাহিনীর এ অবধি এসে থেমে বললেন, "খবর পেয়েছি আমার আর পাঁচটি বোন মারা গেছে শ্বশুর বাড়ীর অত্যাচারে। ওদেরও বিক্রি করা হয়েছিল আমার মত। বড়লোকের ঘরে বিকিয়ে যাওয়ার অত্যাচারও বেশি ভোগ করতে হয় তাদের। আমার বোনেদের জীবনের এই পরিণাম আমার মধ্যে এক আলোড়ন আনে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। আমি অদৃষ্টের বিরুদ্ধে লড়তে উঠে দাঁড়াই।"

১৯২৫ সালের বিপ্লবের শুরুতে সতেরো বছরের কাং কা-চিংকে আর ঘরে রাখা গেল না। সোভিয়েট-ফেরতা কিছু ছাত্র গ্রামে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। উ ফান্‌-ওয়ান্‌ গ্রামে তাদের বক্তৃতা শুনতে গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে—সব

সভারই এক কোণায় দেখা যায় কাং কা-চিংকে, আগ্রহে প্রতিটি কথা মনে গেঁথে নিচ্ছে। মেয়ের ভাবগতিক দেখে বাপ-মার তো ভয়ে প্রায় হাত-পা সেঁধোনোর অবস্থা। একে বৌটার স্বামী জন্মাল না, এমনি কপাল, তায় যদি ঘর ছেড়ে রাজনীতি শুরু করে! এমনিতেই ঠিক হয়ে ছিল হয় অন্য গ্রাম থেকে একটা ছেলে পুষ্যি নিয়ে কাং কা-চিংকে তার বৌ করে ঘরে রাখবে, নয় দেবে তাকে বিক্রি করে। মেয়ে-মানুষকে দিয়ে যখন চাষ আবাদ হবে না তখন তাকে গলায় আড় হওয়া কাঁটার মত বিঁধিয়ে রাখা বোকামি। তার ওপর ভয়—পয়সা দিয়ে কেনা মেয়েটা যদি পালায়! আতঙ্কে বিমর্ষ চাষী দম্পতি তাই মেয়েটাকে একদিন ২৬২ ডলারে বিক্রি করে দেয়। সভা থেকে সেদিন ঘরে ফিরে কাং কা-চিং অবাক হয়ে দেখে—পরিপাটি খাবার সাজানো—এত ভাল খাবার সে জীবনেও দেখেনি একসঙ্গে। সন্দেহে তার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সজল চোখে মা বলে, "খা, খা, বড় ভাল খাবার।" অপরাধীর মত বাপ বলে—"উপায় ছিল না।" উত্তেজনায় কাং কা-চিং হাত মুঠো করে চেঁচিয়ে ওঠে—"আমাকে বিক্রি করার অধিকার কারো নেই—কারো নেই। আমি বেচা-কেনার বিয়ে মানব না। বুঝেছ? কখনও নয়।"

শুরু হল তার বিদ্রোহী জীবন। ঝাঁপিয়ে পড়ল সে নারী সংগঠনের কাজে। প্রতি পদে বাধা। বাপের কাছে শমন এসেছে বিক্রি হওয়া মেয়েকে দিয়ে দিতে হবে বছর ঘুরলে। গ্রামের প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠানগুলো কাং কা-চিং-এর পক্ষ নিয়ে লড়ছে। জীবন থাকতে মানবে না সে গরু-ছাগলের মত বিক্রি হওয়ার এই ব্যবস্থা। নিরক্ষর ছিল সে এতদিন। গ্রামের সাম্যবাদী সংগঠকদের সাহায্যে শুরু হল তার বর্ণপরিচয়। রাত জেগে জেগে নতুন দুনিয়াকে আবিষ্কার করতে লাগল প্রতিটি নতুন অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

১৯২৭ সালে কুওমিনটাঙ-এর বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লব দমে গেল। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে শহীদদের রক্তের বন্যা ছুটল। গ্রামের অন্যান্য অনেকের সঙ্গে কাং কা-চিঙের নামও উঠল পুলিশের খাতায়। ধানের মরাইয়ের নিচে লুকিয়ে দিন কাটায় সে, আর শোনে তার সাথীদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতনের খবর। ফাঁসি হল গ্রামের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতার। ঘরে ঘরে দারুণ বিক্ষোভ আর অটুট

দৃঢ়তা। "লাল সেনা আসবে—ভয় নেই—আমরা মুক্ত হব", চাষীরা মুখে মুখে আশার বার্তা ছড়াতে লাগল। আর সত্যি তাদের সে আশা লাল সেনা হয়ে দেখা দিল একদিন গ্রামের সীমানায়। লাল নিশান উড়িয়ে গ্রামকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসছে লাল সেনা—চীনা চাষীর প্রিয় সন্তান। তাদের প্রথম পংক্তিতে মাও সে-তুং আর চু-তে। "জয়, চীন বিপ্লবের জয়"—তিনদিন ধরে চলল দারুণ লড়াই। মুগ্ধ কাং কা-চিং অবাক হয়ে দেখল লাল সৈন্যদের কীর্তিকলাপ। মানুষের বুকে আশা এনে দেবার অদ্ভুত ক্ষমতাই তাদের যেন সব চেয়ে বড় হাতিয়ার।

কিন্তু পিছু হটতে হল শত্রুর পৈশাচিক আক্রমণের সামনে। গ্রামের বহু চাষী ঘর ছেড়ে চলল মুক্তি-সেনার সঙ্গে। তাদের সঙ্গে অনভ্যস্ত পা ফেলে চলল কাং কা-চিং—পাহাড়ী পথ ভেঙে, বরফ আর পাইনের বন পেরিয়ে, মাও সে-তুং আর চু-তে'র হাতের ঝাণ্ডা লক্ষ্য করে। ছুটে এসে বাপ অসহায়ের মত ডাকল—"ওরে কোথায় যাস্? তোকে বিক্রি করার টাকা তো সব খরচ হয়ে গেছে। জমি ক্রোক করে নেবে যে ওরা।" এগিয়ে যেতে যেতে কাং কা-চিং উত্তর দিল, "কিন্তু বাবা আমরা ফিরে আসব। এখন যদি জমি কেড়েও নেয় ওরা—আমরা এলে ভূমি-সংস্কারে তুমি জমি পাবে—ভয় কি ?"

এই অবধি বলে কাং কা-চিং থেমে গেলেন। তারপর খানিক ভেবে হেসে বললেন, "কি অদ্ভুত উত্তেজনা আর উদ্দীপনার দিন সে সব। পাতলা একটা জামা আর ভারী একটা বন্দুক ছাড়া আর কিছু ছিল না আমার। ঠাণ্ডাকে ঠাণ্ডা বলে মানতে শিখিনি আমরা। আমাদের বিশ্ববিখ্যাত 'লং মার্চ'-এর তিরিশ জন মেয়ের একজন হবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেদিন থেকে আজ অবধি বহু পথ চলেছি—বহু নতুন জিনিস শিখেছি। মাও সে-তুং আর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তার জোরেই আজ আমরা চীনের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ মুক্তি আদায় করেছি।"

চীনের আন্নাকালী, দেড়মাসেরও কম বয়সে ঘর-খোয়ানো কাং কা-চিং আজ জঙ্গী মেয়েদের নতুন সমাজ সংগঠনের কাজের পুরোভাগে। সেনাপতি চু-তে'র সহ-

কর্মিনী, বন্ধু ও স্ত্রী কাং কা-চিং কর্মপ্রেরণার জোরে প্রমাণ করেছেন বেচাকেনা-পণ দিয়ে বিয়ের অসারতা—প্রমাণ করেছেন মেয়ে হবার মূল্য। চীনা চাষীরা তাই আজ আর "বৌয়ের মেয়ে হয়েছে" শুনলে শ্মশান-যাত্রীর মত বিমর্ষ হয়ে পড়ে না। আদর করে মেয়ের নাম রাখে "তোতি" (জমি পাওয়া) বা "ফান স্থ" (আয় বাড়া)। চীনের অন্যান্য সকলের মতই কাং কা-চিঙের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গভীর ভালবাসা, তার সম্বন্ধে জানবার অসীম আগ্রহ।

পিকিং ছাড়ার দিন দুই আগে চীনা গণতান্ত্রিক নারী সংঘের বাগানের একধারে দেখি কাং কা-চিং একদল অসাধারণ স্বাস্থ্যবান বাচ্ছার সঙ্গে আলাপ করছেন। কাং কা-চিং নারী সংঘের শিশু বিভাগের ভারপ্রাপ্তা। সমস্ত জীবনীশক্তি ঢেলে দিয়েছেন শিশু জীবনের উন্নতির পরিকল্পনায়। এই সব চাষী মজুরদের বাচ্ছারা, যারা আজ গান গেয়ে স্কুল যাচ্ছে,—আগে পথে ঘাটে, ধূলোকাদায়, রোগে অর্ধেক সাবাড় হ'ত, বাকি অর্ধেক আধ-বাঁচা হয়ে খাটত জমিদার আর সাম্রাজ্যবাদের পুঁজি বাড়াতে। এই সব বাচ্ছাদের ন্যায্য প্রাধান্য দিতে গড়ে উঠছে তাদের স্কুল, হাসপাতাল, শিশু-সেবাসদন, 'ক্রেশ্', 'কিন্‌ডারগার্‌টেন'—আর সেই সব বাচ্ছাদের মা ও বন্ধু কাং কা-চিং মায়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে এই বিরাট পরিকল্পনাকে রূপ দিচ্ছেন।

বাচ্ছাদের ভিড়ে, কাং কা-চিং-এর হাত ধরে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক ডাঃ কোটনিস্-এর সাত বছরের ছেলে। কাং কা-চিং-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র। আমি কাছে আসতে হেসে তাকে বললেন—'কি—যাবে নাকি মাসীর সঙ্গে ভারতবর্ষে—তোমার বাপের দেশে?' 'না, না, আমি চীনে, আমি কোথাও যাব না—যেতে চাই না'—টানা বড় বড় চোখ মেলে ছোট্ট কোটনিস্ তাড়াতাড়ি বলে উঠল। তার স্বাস্থ্যে ফেটে পড়া লাল গাল দুটো উত্তেজনায় আরও লাল হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো আরও কালো, আরও বড় দেখাচ্ছে। 'দ্যাখো, দ্যাখো, ভারতবর্ষের মানুষের মত সুন্দর ওর চোখ—নয়? কাং কা-চিং তার কপালের চুল ঠিক করে দিতে দিতে বললেন। তারপর ওদের স্কুলের সময় হতে ওদের চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'ও যেন চীন আর ভারতবর্ষের বন্ধুত্বের প্রতীক। আমরা চীনে এক বিরাট পরিবার গড়ে তুলছি। সে পরিবারে

সকলের ঠাঁই হবে। গৃহহীন থাকবে না কেউ। আর এ পরিবারে ছোট্ট কোটনিস্ তার ন্যায্য জায়গা অধিকার করবে। ও বাচ্ছা তাই আজ প্রতিবাদ করছে অমনভাবে। ভয় পায় পাছে চীন ছেড়ে চলে যেতে হয়। যেতে চায় না ভারতবর্ষে। কিন্তু বড় হলে ও নিজেই চাইবে যে-মহান দেশ থেকে ওর বাপ এসেছিলেন সে-দেশ দেখতে।' তারপর আরও নরম গলায় বললেন, 'ফুলের মত ওরা— ওরাই ভবিষ্যৎ।'

চীনের আন্নাকালীরা আজ ঘরে ঘরে এমনি স্বাধীন, মাতৃত্বের দায়িত্বে এমনি সচেতন। তারা জীবনে এক নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। সেই পথ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মেয়েকে ও মাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এক চাষী-মা

বাংলার ঘরে ঘরে কত লক্ষ কোটি চাষী মায়ের অভিশপ্ত জীবনের কাহিনীর সঙ্গে আমার এ-গল্প মিশে আছে। চীনের মায়েদের অতীত জীবনের গল্প শুনলে মনে হয় এ যেন আমাদেরই বর্তমান জীবনের কথা।

চাষী-মার কথা বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানা ধ্বসা কুঁড়ে ঘর। তার দাওয়ায় শীর্ণ হাতে কঙ্কালসার বাচ্ছাকে বুকে করে অবিশ্রাম খেটে চলেছে একটি মা। তার গর্তে-বসা চোখে গভীর স্নেহ। আকালের সময় সে মুখ আরও শীর্ণ হয়। কোলের ছেলে মরে যায়। মাকে আর মা বলে চেনা যায় না।

পুরনো চীনে চাষী মায়ের কথা বলতে গেলে ঠিক এমনি কোন ছবি ভেসে উঠত মানুষের চোখে। সন্তান-উৎপাদনের একটি যন্ত্র থেকে মা কি করে সত্যি মা হল তার কাহিনী এখানে বলছি এই আশায় যে জীবনের এই অপূর্ব বদলের কথা আমার দেশের অভাগী মায়েদের বুকে একটু উত্তাপ দেবে।

শান্সী প্রদেশে, লুং চেং জেলার ছোট্ট গাঁ চাং-তুং। এটুকু গাঁ, কিন্তু তাতে গোটা চীনের স্পন্দন পাওয়া যেত। চীনের ইতিহাস লেখা হচ্ছিল এ গাঁয়ে।

১৯৩৭ সালে চাং-তুং পড়ল জাপানী বর্বরদের হাতে। ঘর জ্বলল। মা বোনের ইজ্জত নষ্ট হল। চাষী জমি হারিয়ে আরও দীনহীন হল। বিদ্রোহের জ্বালা জ্বলে উঠল তাদের মনে। যত হাহাকার ওঠে ঘরে, যত খাজনা বসায় জাপানীরা, তত জ্বলে পুড়ে অসির মত ধারাল হয়ে উঠছিল চাং তুং গাঁয়ের অধিবাসীরা।

এই গাঁয়ে ছিল এক বউ। তার নিজের নাম অবধি সে মনে করতে পারত না। গাঁয়ের অন্যান্য বউদের মত তাকেও লোকে 'অমুকের বউ' বলে ডাকত।

ছেলে হবার পরে ডাকত 'অমুকের মা' বলে। কেউ তার নিজের নাম জিজ্ঞেস করলে সে অবাক হয়ে যেত। বিপ্লবের পরে ভূমি-সংস্কারের কর্মীরা যখন তার নাম জিজ্ঞেস করে, অনেক কষ্টে, অনেক ভেবে চিন্তে সে মনে করতে পেরেছিল যে ছোট বেলায় তার নাম ছিল 'হো'।

ছোট বেলায়, তার ভাসা ভাসা মনে পড়ে, সম্ভবত যখন তার ছ'বছর বয়েস, ওর পায়ের আঙুল ভেঙ্গে দিয়েছিল যাতে পা না বাড়তে পারে। যে মেয়ের পা যত ছোট হবে, যত সে কষ্টে হাঁটা-চলা করবে সে মেয়েই সুন্দরী বলে গণ্য হবে। তার যন্ত্রণা লাঘব করতে তার মা এসব কথা তাকে তখন বুঝিয়েছিল।

অদ্ভুত এই বউটির জীবন। চীনের অন্য মেয়েদের মত খুব ছোট বয়েসে তার বিয়ে হয়। লেখা পড়া শেখার প্রশ্নই ওঠেনি কোনদিন। আর জীবনে যে কিছু চাইতে হয় বা চাওয়া যায় একথাও তার জানা ছিল না। জীবনটা শুধু ছিল একটানা একটা খাটুনী। সংসারের হাজার খুঁটিনাটি, অর্থহীন কুসংস্কার আর গঞ্জনা ছিল তার রাতদিনের সাথী। কালক্রমে একটি ছেলে হল তার। স্বামীর ছোট্ট একটি দোকানের আয়ে কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে যায় তাদের।

১৯৪২ সালে সারা শান্সী প্রদেশ জুড়ে এল দারুণ আকাল। চাষীর জমি গেল। মধ্যবিত্ত নেমে এল সর্বহারাদের ভীড়ে। গাঁয়ে গাঁয়ে হা-ভাতে আর হা-ঘরেদের মিছিলে হো, তার স্বামী আর ছোট ছেলেটি মিশে গেল। গাঁ ছেড়ে চলেছে তারা। জানে না কোথায়।

একদিন দুপুরে আর পা চলে না। একটা গাছের ছায়ায় এলিয়ে পড়ল হো। তার স্বামীও খানিক বসল। তারপর হো'র কোল থেকে ছেলেটাকে টেনে নিয়ে পাশের গাঁয়ের দিকে যেতে যেতে বলে গেল,—"খাবারের খোঁজে চললাম।" হো'র কানে স্বপ্নের মত শোনাল কাথাটা—আবছা দূর-দূর। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে হো'র শুধু মনে পড়ল তার স্বামীর চোখের দৃষ্টি—ভয় খাওয়া জন্তুর মত।

সূর্য হেলে গিয়েছে। যেন কত যুগ পরে হো'র ঘুম ভেঙেছে। ক্লান্ত চোখ জোড়া পথের উপর ফেলে সে ভাবতে চেষ্টা করল। কত যুগ সে এই গাছ তলায়

পড়ে আছে? অনেক দূরে দেখল একটা লোক এগিয়ে আসছে। তার হাতে একটা পোঁট্‌লা। ক্লান্ত লোকটা পা টেনে টেনে হাঁটছে। এক পা এক পা করে কাছে এগিয়ে এল সে, তারপর হো'র কাছে এসে থামল। চোখ জোড়া তার ভয় খাওয়া জন্তুর মত।

মুহূর্তে লাফিয়ে উঠল হো। তার বুক চিরে বেরিয়ে এল, "কোথায়, কোথায় সে? কোথায় আমার বাচ্ছা?" পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার স্বামী। তারপর তার ভয় খাওয়া জানোয়ারের মত দৃষ্টি মাটির দিকে ফেলে ভাঙা ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় শুধু উচ্চারণ করল, "আও জেলার জমিদারের কাছে বেচে এলাম ওকে।"

হো শুধু চেয়ে রইল। স্তম্ভিত হয়ে সে শুধু চেয়ে রইল। তারপর গলন্ত লোহার মত গরম চোখের জল বুক ফেটে নেমে এল—মায়ের চোখের জল। কিছু তার বলার নেই, করার নেই। শুধু বুক ফাটা কান্না আর প্রাণভরা ভালবাসা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই তার নেই।

আবার শুরু হল একটানা চলা। দিনের পর দিন। এক পা করে চলে আর পাঁজরের ভেতরের শব্দে ভয় ধরে যায়—কবরখানার মত খালি লাগে ভেতরটা। ভিক্ষে চায় মাঝে মাঝে কিন্তু কে দেবে ভিক্ষে! সব খাবারই জমেছে জমিদার আর জোতদারদের গুদোমে। আর এরা যদি ভিক্ষেই দেবে তবে জমাবে কেন খাবার! যখন সমস্ত চাষীরা হন্যে কুকুরের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন সরকারী বন্দুক মোতায়েন আছে জমিদারের গোলা আগলাতে! যখন পথের মরাদের দেখে আধ-মরাদের বুকে কাঁপুনী ধরছে—তখন চাষী নেতাদের দেওয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারছে সৈন্যরা। এসবের মাঝখানে হো-রা এগিয়ে চলেছে—ছায়ার মত। শুধু একটি কথা তাদের তখনও মনে আছে—"বাঁচতে হবে।"

এতদিন ছেলে বিক্রির সব পয়সা ফুরিয়েছে। এখন আর চলা নয়। শুধু শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করা। সেদিন সন্ধ্যেবেলা এক সরাইখানার সামনে এসে তাদের সব শক্তি ফুরুলো। তারা ভাবল—এই শেষ। আর এক পা-ও চলা নয়।

সরাইখানার মালিক, তার চোখ দেখলে বুনো নেকড়ের কথা মনে হয়, আপ্যায়িত করে তাদের ভেতরে এনে বসাল। "আরে আসুন, আমার অতিথি-শালায় দুটি খেয়ে নিন। মনে হচ্ছে অনেক ঘুরেছেন।"—সরাইখানার মালিক বিনয়ে গলে পড়ে বলল। নিতান্ত অসহায়ের মত হো'র স্বামী আওড়ে গেল—"পয়সা নেই আমাদের—একটিও পয়সা নেই কিন্তু।" লোকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, "আরে তাতে কি?"

চেটে পুটে খেল দু'জনে। বাটি বাটি ভাত আর ঝোল। কাঠি দিয়ে ধৈর্য ধরে খাবার মত অবস্থা ছিল না তাদের; বাটি মুখের সঙ্গে লাগিয়ে গিলে গিলে খেল। যত চায় তত দেয় লোকটা। শেষ বাটিটা থেকে খুঁটে খেতে খেতে হো'র স্বামী সবে ভাবছে লোকটাকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দেবে, হঠাৎ কর্কশ গলায় সে হাঁকল, "ওহে দামটা ছাড়ো।"

নির্বাক হয়ে কথাগুলো শুনল ওরা। চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে এসেছে তাই ভাল বুঝতে পারেনি। ওরা কিছু না বলে চেয়ে রইল। ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। অসহায় ভাবে হো'র স্বামী উত্তর করল, "আমি ত আগেই বলেছিলাম আমাদের একটাও পয়সা নেই।"

লোকটা রেগে প্রায় লাফাতে লাগল। তন্দ্রার মধ্যে হো দেখল ওর স্বামীর মুখ—চোখ তার ভয় খাওয়া জানোয়ারের মত। খুঁটিতে ঠ্যাসান দিয়ে সে চোখ বুঁজল। সরাইখানাওয়ালা টানতে টানতে নিয়ে গেল হো'র স্বামীকে। ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "পয়সা নেই বললে চলবে না। নগদ না দিতে পারো বউ বেচ। নয়তো পুলিশ ডাকব।" তারপর গলায় একটু সহানুভূতি মাখিয়ে বলল, "বেশ তো, বউকে আমিই কিনব। তাতে খাবারের দাম শোধ হবে। আর এই নাও কিছু টাকা—" বলে তার হাতে দুটো নোট গুঁজে দিয়ে সরাইখানাওয়ালা ফুর্তিতে হাত কচ্‌লাতে লাগল। এত সস্তায় মেয়েমানুষ সে আগে কখনও কেনেনি।

"ব্যস্‌, সোজা রাস্তা ধরে কেটে পড়ো—" বলে সরাইখানাওয়ালা তার ঘাড়ে আস্তে ধাক্কা দিল। সে বউ-এর দিকে একবার তাকাল। কেমন ধন্দ মেরে গিয়েছে। চিন্তা করবার শক্তিটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। বাইরের অন্ধকারের

মধ্যে মিশে যেতে যেতে সে শুধু আকাশের দিকে চাইল কয়েকবার। বোধ করি আকাশটাকে সাক্ষী মানতে চাইল।

রুক্ষ ভাবে হো'কে ঠেলে তুলল সরাইখানাওয়ালা, "এই মাগী, ওঠ বলছি। চল্ আমার সঙ্গে।" হকচকিয়ে উঠে পড়ে হো এদিক ওদিক চেয়ে ব্যাকুল হয়ে বলে উঠল, "হ্যাগো, আমার মানুষটা কোথায় গো?" দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, ভেঙিয়ে লোকটা বলে উঠল "আমার মানুষ! আহা রে—। বলি, জানিস নে, আমি যে এখন থেকে তোর মানুষ রে হারামজাদী। তোর স্বামী তোকে বেচে দিয়ে গেছে। আবার আমি তোকে বেচলে তোর অন্য মানুষ হবে। ততদিন অবধি আমি তোর মানুষ। বুঝেছিস? চল্, চল্।"

কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত ঘটনাটা হো'র কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে বুঝল এক বেশ্যার দালালের হাতে পড়েছে সে। কি করে এ নরক কুণ্ড থেকে বার হবে! ভেবে পায় না। মন পাথরের মত ভারী হয়ে ওঠে। বিদ্রোহ করবে? কিন্তু কি করে? ভগবান, আমার মাতৃত্বের আর কত অপমান করবে তুমি?

এক আদ্যিকালের বুড়ো, সরাইখানাওয়ালার ইয়ার লোক, খুব সস্তায় হো'কে কিনে নিল। আকালের মেয়েছেলে, রোগা যেন কাঠি—তায় প্রায় পড়ে পাওয়া। সরাইখানার মালিক আর বিশেষ দরাদরি করল না।

হো উদয়াস্ত খাটে। যেন ঘানির বলদ। তার কোটরের মধ্যে ঢোকা চোখ দুটো শুধু জলে—কিসের আগুনে, হো নিজেই জানে না। প্রতিদিন রাতে শুতে যাবার সময় কুৎসিত প্রস্তাব করে বিট্‌কেল বুড়োটা। হাত বাড়িয়ে বলে, "আয় আয়। নগদ পয়সা দিয়ে কিনেছি বাবা। অমনি মাল নয়। আয় বলছি নিমকহারাম খচ্চর মেয়েছেলে।" ফণা-তোলা গোখরোর মত ফোঁস করে উঠত হো। বুড়োর হাত কামড়ে দিত কিন্তু কিছুতে কাছে যেত না। অনেক চেষ্টার পর হয়রান হয়ে বুড়ো একদিন হো'কে জলের দরে বিকিয়ে দিল। 'নিমকহারাম মেয়েছেলে' বলে হো'র বদনাম হয়ে যাওয়ায় ওর চাহিদা হল না মোটেই। শেষে বুড়োর এক দূর সম্পর্কের খুব গরীব আত্মীয় হো'কে কিনে নিল। বেচারী কোনদিন আশা করেনি ঘরে বউ কিনে আনতে পারবে, মরার সময় মুখে জল দেবার

মত প্রিয়জন থাকবে ঘরে। গরীব চাষী সে। ছোট ঘর। তাই উঁচু মন। তার ভাঙা কুঁড়েতে হো'র সত্যিকারের ঘর মিলল। কিন্তু থাকে কি থাকে না এইটুকু ভিটে মাটি। জমির জন্যে কাঙ্গাল দুজনের মন। হো ভাবে—"যদি পেতাম একটুখানি জমি আর আমার বুকের মানিককে।"

গণমুক্তি ফৌজ ঝড়ের মত এগিয়ে এল। চাং-তুং গাঁকে স্বাধীন করল তারা। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সবাই জমি পেল। হো-রাও নিজেদের জমিতে লাঙল দিল।

তার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ছোট একটি ছেলে "মা—" বলে ডেকে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আও জেলার জমিদারের কবল থেকে মুক্ত করে মুক্তি-ফৌজ তার বুকের মানিককে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

এখন হো তার আঙ্গিনায় ছেলের পাশে বসে ধরে ধরে লিখতে শিখছে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গাঁয়ের সমবায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে সে স্নেহমাখা চোখে তার ছেলের দিকে চাইছে। তার হারানো মাতৃত্ব আজ সে ফিরে পেয়েছে। ছেলে আজ তার, আর তাকে বাঁচাবার অধিকারও তার মুঠোয়।

গরীব চাষীদের সমালোচনা-সভায় হো নিজের মুখে বলল তার জীবনকাহিনী। কাহিনী শেষ ক'রে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল, "কান্নার দিন গেছে। এবার আনন্দের দিন গড়ার সময় হয়েছে।"

লং-মার্চের গল্প

সারি সারি কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক সাজানো। বিরাট এলাকা জুড়ে সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজ হচ্ছে। আমরা কাছে গেলাম। সারি সারি সাজানো ট্যাঙ্কগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের দলের একজন ইউরোপীয় বান্ধবী জিজ্ঞেস করলেন, "এসব নিশ্চয় চীনে তৈরী হয়নি। এগুলো কি—" শেষ করতে ইতস্তত করলেন। প্রশ্নটি করা হয়েছিল গণমুক্তি-ফৌজের এক সেনানায়ককে। তিনি হেসে উত্তর করলেন, "না রুশ নয়, মার্কিনী।" "মার্কিনী—এত ট্যাঙ্ক!" বিস্ফারিত চোখে ইউরোপীয় বান্ধবী চেয়ে রইলেন। আমাদের দলের মার্কিনী প্রতিনিধির দিকে চেয়ে সেনানায়ক বন্ধুসুলভ ঠাট্টা করে বললেন, "তোমাদের সরকারকে ধন্যবাদ। আমাদের কম রসদ জোগায়নি। চিয়াংকে যত রসদ পাঠাত মার্কিন-সরকার, ততই সরঞ্জাম বাড়ত আমাদের। কারণ আমরা সময়ে যুদ্ধ করে চিয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে সব কেড়ে নিতাম। একবার বিশ্রী কিছু টিনের খাবার উদ্ধার করে আমরা খুব গালাগাল করেছি। ভাল জিনিষ পেলে প্রশংসা করেছি। যেন আমাদের পাঠিয়েছে! আজ ওদের সংকট এমনি যে, নিজেদের অস্ত্রে নিজেরা ঘায়েল। তবু তোমাদের দেশবাসীদের সান্ত্বনা যে তারা যে খাজনা সরকারকে দেয় তার একটা হিল্লে হচ্ছে। কি বল?" মার্কিনী বান্ধবী হেসে বললেন, "আমাদের সরকার নিজের পরাজয়ের দুঃস্বপ্ন দেখে বলেই আজ সে এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।" আমরা সব পরখ করে দেখলাম। এমন কি যেসব চামচেতে এরা আমাদের খেতে দিল তাতে গোটা গোটা অক্ষরে খোদাই করা আছে—U. S. NAVY কিম্বা MADE IN USA.

এই যে বিরাট গণমুক্তি ফৌজ, তার ইতিহাস এত বিচিত্র, এত রোমাঞ্চকর যে, শুনতে শুনতে মনে হয় দুনিয়ার মানুষের সামনে চীৎকার করে বলি—দেখ, কি

আশ্চর্য মানুষেরা আমাদের মধ্যে বাস করছে! মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারায় শিক্ষিত ৪০ লাখ সৈন্য ৫০ কোটি চীনবাসীর প্রাণ, মান আর সভ্যতা বাঁচাবার জন্যে অহরহ জীবন বিপন্ন করছে। তাই ঘরে ঘরে চীনের মানুষ এদের বলে "মুক্তি-ফৌজ হল আমাদের সন্তান—আমাদের গর্ব।"

এই ৪০ লাখ সৈন্যকে মুক্তির লড়াই-এ যিনি নেতৃত্ব দেন, তাঁকে চেনে না এমন লোক পৃথিবীতে কম। যেদিন প্রথম সেনাপতি চু-তের সঙ্গে আলাপ হল, সেদিন অনেকক্ষণ ধরে দূরে বসে বসে তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। মনে ভেবেছিলাম সেনাপতি চু-তে'কে দেখতে নিশ্চয় পালোয়ান-গোছের হবে। অন্তত চেহারায় থাকবে একটা জাঁদরেল ভাব। কিন্তু কই, এ যেন অতি শান্ত শিষ্ট একটি চাষী, জমিতে ধান বুনে ফসলের দিন গুনছে। মাথায় ছোট খাট মানুষটি। চুলে পাক ধরেছে। মুখখানা সব সময় হাসি হাসি। আস্তে চলা ফেরা করেন। কথা প্রায় বলেন না বললেই হয়। যখন কাউকে অভিনন্দন জানান, সে সাধারণ মজুরই হোক বা খুব নাম করা নেতাই হোক, ব্যবহার হয় ঠিক সমান।

আমি বসে বসে এই সব লক্ষ্য করছি। সরকার আমাদের জন্যে বিরাট ভোজের আয়োজন করেছেন। সভাপতি মাও চীন-সোভিয়েট বন্ধুত্ব-চুক্তি সই করতে মস্কো গিয়েছেন। তাই তাঁর জায়গায় সমস্ত আপ্যায়নের ভার পড়েছে সেনাপতি চু-তে ও মন্ত্রী চৌ এন-লাই-এর ওপর। বিরাট হল ঘরে ঝলমল করছে আলো। সারি সারি টেবিলে ভোজের আয়োজন। আমার টেবিলে আর যাঁরা বসেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পংক্তিতে পড়েন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে লিউ শাও-চির সামনে আমি বসবার আসন পেয়েছি। তাঁর পাশে কোরিয়ার বিখ্যাত নেত্রী পাক ডেন-আই। তারপর চৌ এন-লাই আর সোভিয়েট নেত্রী পারফিওনোভা। মাদাম মারি ক্লোদ ভাইঅঁ-কুতুরিয়ে ও মাদাম মোরিস্ থোরেজের মাঝখানে সেনাপতি চু-তে'র শান্ত মুখখানা চোখে পড়ছে।

সরকারের পক্ষ থেকে চু-তে আমাদের সাদর নিমন্ত্রণ জানালেন। শান্ত কথাগুলো মেপে মেপে বললেন। এত শান্তভাবে বললেন যে, বিশ্বাসই হচ্ছিল না ভোজ শেষ হলে উনিই আবার ক্যানটনে আর তিব্বতে মুক্তি-ফৌজের গতিবিধির

ওপর আদেশ জারি করবেন। তারপর অনেকে বললেন। লিউ শাও-চির তীক্ষ্ণ চাহনি, চৌ এন-লাই-এর হাসিভরা মুখ আর ধারালো কথা, মাদাম চাই-চাং-এর সস্নেহ চোখ-জোড়া সমস্ত মিলে আসর জীবন্ত হয়ে উঠল। বক্তার পর বক্তা স্বাস্থ্য পান করতে উঠে চীন বিপ্লবের তাৎপর্য, দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের মুক্তির অভিযান সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। আমি অবাক হয়ে সব শুনছি। হঠাৎ চৌ এন-লাই আমাকে বললেন, "তোমাকে কিছু বলতে হবে।" মুহূর্তে আমার হাত-পা হিম। "আমি, আমি কী বলব?" অসহায় ভাবে জানালাম। উনি ছাড়লেন না। বললেন, "ভারতবর্ষকে বলতেই হবে—আমরা কত যুগের বন্ধু বলো তো—চীন আর ভারতবর্ষ? এখন আমাদের মুক্তি-ফৌজ তো তোমাদের ঘরের কাছে।" বলে দু'হাতে ঝাঁকানি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। "একটা টোস্ট করো"—চৌএন-লাই অনুরোধ করলেন।

ভারতবর্ষের মেয়ে। টোস্ট্ করার রীতিনীতি ঠিক জানা নেই। উঠে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত শুধু চেয়ে রইলাম বিরাট হলের ঝাড়-লণ্ঠনগুলোর দিকে। তার নীচে দেখলাম অগণিত মুখ সাগ্রহে চেয়ে আছে। চোখে পড়ল চু-তে'র শান্ত, অল্প হেঁট মাথা। মুক্তি-ফৌজ ভারতবর্ষের গায়ে।

"আমি ভারতবর্ষের সামান্য এক মেয়ে।" আমার গলা হলের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। আজ মাও সে-তুং, চু-তে, চৌ এন-লাই, লিউ শাও-চি ও অন্যান্য যাঁরা চীনের মহাবিপ্লবের নেতা তাঁরা আমাদের গর্ব। আমি ভারতবর্ষের, এশিয়ার নিপীড়িত মানুষের তরফ থেকে বলছি—আমরা বিশ্বাস করি আজ দুনিয়ার গণ-আন্দোলনের নেতাদের কোন একটা দেশের সীমানায় বেঁধে রাখা যায় না। মাও সে-তুং আমাদের গর্ব, আমাদের নেতা। আজ চু-তে, চৌ এন-লাই, লিউ শাও-চি ও অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে এই হল-ঘরে মিলিত হয়েছি তাঁদের সঙ্গে একাসনে বসতে আমার বুক গর্বে ভরে উঠছে। আজ এই আনন্দের দিনে, আপনাদের হাসিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ছে আমার দেশের অগণিত জঙ্গী ভাইবোনদের কথা। আজ বিশ হাজারের ওপর সংগ্রামী মানুষ জেলে তিলে তিলে পচছে। অনেকে মরছে। তাদের সঙ্গে আজ এই আনন্দ ভাগ করে নিতে আমার সব চেয়ে বেশী ইচ্ছে করছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি·'

যে, আমরা আমাদের জঙ্গী ভাইবোনদের সঙ্গে আজ এই আনন্দ ভাগ করে নিই। আসুন, সেইসব যোগ্য মানুষদের জন্যে—যারা জেলে, দ্বীপান্তরে মরেছে, মরছে—আমরা স্বাস্থ্য পান করি।”

সমস্ত হল নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে এশিয়া, ভারতবর্ষের বন্দী ভাইবোনদের স্বাস্থ্য পান করতে উঠে দাঁড়াল। চু-তের মুখ ভাবগভীর দেখাচ্ছে। এগিয়ে এসে উনি অভিবাদন করলেন। আমার সংগ্রামী ভাইবোনদের জন্যে গর্বে মন আমার ভরে উঠল।

তারপর বহুবার এই আশ্চর্য মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়েছে। একদিন নিমন্ত্রণ এল। চু-তের স্ত্রী কাং কা-চিং জানালেন চু-তে খেতে ডেকেছেন। গল্পসল্প হবে। খুব বেসরকারী ব্যাপার। গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার হোটেলে। “নিষিদ্ধ নগর”-এর আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে লেক, বাগান, সোনালী প্যাগোডা পেরিয়ে গাড়ী এসে চু-তের বাড়ীর দরজায় থামলো। টানা লম্বা বারান্দা। দুপাশের থামে সোনালী কারুকার্য করা। আগে এ বাড়ীতে সম্রাটের কোন সরিক থাকতো সম্ভবত। বাইরের ঘরটি নিখুঁত সাজানো। এতটুকু আড়ম্বর নেই। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সভ্যতার অদ্ভুত সংমিশ্রন এই ঘরটিতে। নয়া-চীনের বুকে যে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠছে তার চিহ্ন এখানে সুস্পষ্ট।

তাইওয়ানে মার্কিণ গতিবিধি সম্বন্ধে সকলে খুব উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। খাবার টেবিলে চু-তের সঙ্গে আছেন একজন অল্পবয়সী সেনানায়ক। চৌ এন-লাই-এর স্ত্রী তেং ইং-চাও, প্রাভ্‌দা-র ওল্‌গা চেচট্‌কিনা, যুব-সংগঠনের নেতৃস্থানীয় দু'জন, কাং কা-চিং, আমাদের দোভাষী ওয়াং, আমি—এই ক'জনে মিলে ছোট একটি টেবিলের চারধারে গোল হয়ে বসেছি। কথায় কথায় সময় কাটছে। আমার দারুণ অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। চু-তের শান্ত মুখ আজ বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। হঠাৎ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা উঠতে নানা কথা বললেন সকলে। চু-তে আলোচনায় যোগ দিলেন। চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বললেন, “লেনিন বলেছিলেন দেশের ৯০ ভাগ লোকের সমর্থন যতক্ষণ না আমাদের পক্ষে আসছে ততক্ষণ বিপ্লব সার্থক হতে পারে না। চীন তার জলন্ত প্রমাণ। আমাদের

সকলেরই ইচ্ছে ঘরের এবং বাইরের শত্রুকে এক্ষুনি শেষ করে দেওয়া। কিন্তু দেখতে হবে আমাদের কে সব চেয়ে বড় শত্রু এবং কার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশী শক্তি আমরা সংগঠিত করতে পারবো। আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদ আমাদের সব চেয়ে বড় শত্রু। তাই তাকে পরাজিত করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য বলে আমরা স্থির করি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শক্তিকে আমরা এক করি। তাই আমাদের সাফল্য। সমস্ত ঔপনিবেশিক দেশ সম্বন্ধে এই একই কথা বলা চলে। ভারতবর্ষের মত আমাদের দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে থাকে। কাজেই গ্রামের আন্দোলনের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল আমাদের। শহরের আন্দোলন কখনই সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না, যদি তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আন্দোলনকে গড়ে তোলা না যায়। আমাদের তিরিশ বছরের সশস্ত্র সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হল যে, সশস্ত্র সংগ্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাকে গ্রামের দিকে নিয়ে যেতে হবে। কারণ, শহরে শত্রু সংঘবদ্ধ, তারা সশস্ত্র বিদ্রোহকে অনায়াসে দমিয়ে দিতে পারে। কিন্তু গ্রামে শত্রু ছত্রভঙ্গ। সেখানে জনসাধারণের মধ্যে লুকিয়ে থাকার যথেষ্ট সুযোগ। শহরে সশস্ত্র সংগ্রাম একমাত্র তখনই সফল হয়েছে, যখন তার চারিধারে গ্রামাঞ্চলের শক্তিশালী আন্দোলন তাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পেরেছে।'

চু-তে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আপনার সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বিশেষ সময়ের টানাটানি। আমাকে উঠতে হবে।" আমি খাওয়া ছেড়ে চু-তেকে মিনিট পাঁচেকের জন্যে আটক করে বহু ছবি তুললাম। ছবিগুলো অবশ্য শেষ অবধি দেশে আনতে পারিনি। পথে জার্মানীতে মার্কিণীরা সেগুলো হস্তগত করে নেয়।

চীনের মেয়েরা কি করে হাজারে হাজারে মুক্তি ফৌজের দিকে আকৃষ্ট হয়, কি করে বহু মেয়ে সমস্ত কিছু ছেড়ে মুক্তি-ফৌজে যোগদান করে—তার কাহিনী শুনবো ব'লে চৌ এন-লাই-এর স্ত্রী তেং ইং-চাওকে ধরে পড়লাম। ফলে, এলাহি খাওয়ার আর একটা অবকাশ পাওয়া গেল। চৌ এন-লাই-এর বাড়ীতে যখন পৌছলাম তখন বিকেল। আটঘণ্টা পরে যখন আলোচনা শেষ হল, তখন

মাঝরাত। আমরা একটুও পরিশ্রান্ত হইনি। আটঘণ্টার বেশী সময় নিমেষে কেটে গিয়েছিল।

গিয়েই অনুরোধ জানালাম যে, তেং ইং-চাও-এর জীবনী দিয়ে আমরা চীনের মেয়েদের জানতে চাই। উনি আপত্তি করলেন। বললেন, চীনে ওঁর মত মেয়ে ঘরে ঘরে। আমরা বললাম যে, সেজন্যেই আমরা ওঁর জীবনী বিশেষ করে জানতে চাই।

উনি ঘণ্টা দুই চীনের মহিলা আন্দোলন সম্বন্ধে বললেন। তারপর আমাদের অনুরোধ রেখে নিজের জীবন বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলেন:

"১৯০৩ সালে কোয়াংসি প্রদেশে ন্যানিং শহরে আমার জন্ম। আমার বাপ-মায়ের আমি একমাত্র সন্তান। আমার যখন ৪।৫ বছর বয়স, বাবা মারা গেলেন। তখনও চিং সম্রাটরা চীনে রাজত্ব করছে। মেয়েদের অধিকার বলে কোন বালাই ছিল না। তাই বাবা মারা যেতে মাকে যখন চাকরী নিতে হল তখন ঢি ঢি পড়ে গেল চারিধারে। সে সময় আমরা টিয়েন্‌ৎসিন চলে এসেছি। আমরা যখন এ শহরে এলাম তখন ১৯১০ সাল। মাকে একাধারে শিক্ষয়িত্রী এবং নার্স দুটো কাজই করতে হত। ফলে শৈশবে আমার কোন পারিবারিক জীবনই ছিল না। ১৯১৩ সালে আমাকে পিকিং-এর অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে মা ভর্তি করে দিলেন। স্কুলটি চালু করেছিলেন তখনকার সোশালিস্ট পার্টি। এই স্কুলের প্রায় সব শিক্ষয়িত্রীই ছিলেন এই পার্টির সভ্য। তাঁদের আলোচনা আমার কানে আসত। ওঁরা বলতেন যে, এমন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে যেখানে মানুষ তার প্রয়োজনমত নেবে, সাধ্য মত দেবে। আমার শৈশব এই আবহাওয়ার মধ্যে নতুন জীবনের স্বাদ পেতে লাগল।

"নতুন গণরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উয়েন সি-কাই চীনের সম্রাট হবার আশায় বিশ্বাসঘাতকতা করল। সে আমাদের স্কুল বন্ধ করে দিল। মা কাজ হারিয়ে আমাকে নিয়ে টিয়েন্‌ৎসিনে ফিরে এলেন। তারপর শুরু হল আমাদের বিখ্যাত '৪ঠা মে'র আন্দোলন। দেশ কেঁপে উঠল। আমিও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হলাম। ছাত্র ইউনিয়নে মেয়েদের গ্রুপ তৈরীর দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর।

আমরা সকলেই ছিলাম ভাসা ভাসা ভাবে সোশালিস্ট—কোন নিয়মানুবর্তিতার ধার ধারতাম না। আমরা তখন অক্টোবর বিপ্লব আর লেনিনের কথা শুনেছি। কিন্তু আমি কিছুই পরিষ্কার বুঝতাম না। তখন চৌ এন-লাই ছাত্রদের কাগজের সম্পাদক ; সেই সময় প্রথম তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়।

"১৯২০ সালে স্কুল শেষ করে আমি শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিলাম। মহিলা সংগঠক হিসেবে নানা গঠনমূলক কাজের ভার পড়ল আমার ওপর। আমরা মেয়েদের অধিকারের জন্যে সংঘ গড়লাম এবং একটি কাগজ বার করলাম। ১৯২৪ সালে আমরা কয়েকজন মিলে "যুব-কমিউনিস্ট সংঘ" গড়লাম। আমি হলাম তাদের প্রচার বিভাগের কর্তা।

"তখন কমিউনিস্ট পার্টি আর কুয়োমিণ্টাং এক সঙ্গে কাজ করছে। কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিণ্টাং-এর যে মিলিত কমিটি সে সময় তৈরী হয়, আমাকে তার সভ্য করা হয় এবং মহিলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হই। আমি কিন্তু তখনও পুরোপুরি সভ্য নই। তখনও মাত্র "যুব-কমিউনিস্ট সংঘ"-র সভ্য। ১৯২৫ সালে আমাকে পুরোপুরি পার্টি সভ্য ক'রে নেওয়া হয়। টিয়েন্‌ৎসিনের পার্টির মহিলা বিভাগের নেত্রী হিসেবে আমাকে পাঠানো হয়।

"সে সময় স্থন ইয়াৎ-সেন একটি জাতীয় কংগ্রেস ডাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আমরা দারুণ উৎসাহের সঙ্গে তার তোড়জোড় করি। ৩০শে মে, ১৯২৫। সাংহাই-এর মজুররা তাদের মহান আন্দোলন স্থরু করল। সেদিন শহীদের রক্তে দেশের মাটি লাল হয়ে উঠল। দেশ জুড়ে মজুরদের দাবীর সমর্থনে আন্দোলন গড়ে উঠল। এদের সমর্থনে চারিদিকে সংগঠন গড়া হল।

"১৯২৫ সালের পুরোটা কাজে ঠাসা। ক্যান্টনে ডাক পড়ল। পার্টির মহিলাদের সম্মেলনে যোগ দিতে গেলাম। সেখানে আলাপ হল চাই-চাং প্রভৃতি বিভিন্ন মহিলা নেত্রীদের সঙ্গে।

"সে সময়ে চৌ এন-লাই জাতীয় বিপ্লবী ফৌজের রাজনৈতিক কমিসার। সে বছর আমাদের বিয়ে হল।

"১৯২৬ সালে কুয়োমিণ্টাং-এর পার্টি কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিছু

কিছু কমিউনিস্ট নির্বাচিত হলো। মাও সে-তুং প্রভৃতি পুরোপুরি সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হলেন। আমি প্রার্থী সভ্য হিসেবে নির্বাচিত হলাম।

"১৯২৭ সালে বিপ্লবের প্রতি কুয়োমিণ্টাং বিশ্বাসঘাতকতা করল। চারিদিকে অকথ্য অত্যাচার শুরু হল। চৌ এন-লাইকে গা ঢাকা দিতে হল। উনি তখন সাংহাইতে। সে সময় আমি হাসপাতালে। সবে বাচ্ছা হয়েছে। হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় লোক। বিপদ বুঝে আমাকে আগলে রাখলেন এবং বাচ্ছা হবার একমাস পরে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি তখন এত অসুস্থ যে, মায়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমাকে পালাতে হল একদিন মাঝরাতে।"

এইখানে এসে তেং ইং-চাও দম নিলেন। চোখ দুটো অন্যমনস্ক দূর-দূর হয়ে গেল। অন্যের কাছে শুনেছিলাম সেই সময় এই কষ্টের মধ্যে বাচ্ছাটি মারা যায়। ওঁকে আর জিজ্ঞেস করলাম না। উনিও আর সে কথা তুললেন না। নিজের একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর কথা কোন মায়েরই বলতে ইচ্ছে হয় না।

আমাদের ফল-ডালমুঠ খাবার তাগিদ্ দিয়ে আবার শুরু করলেন, "১৯২৭ থেকে ১৯৩২ অবধি সাংহাইতে গা ঢাকা দিয়ে রইলাম। জীবনের সে এক বিভীষিকাময় অধ্যায়। সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকা। এক মুহূর্ত স্বস্তি ছিল না। প্রতি মুহূর্তে পুলিশের হানার সম্ভাবনায় সকলে অস্থির হয়ে থাকত। কখনও শুনতাম আমাদের থাকতে দেবার অপরাধে আমাদের বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করছে পুলিশ।

"আমাদের জীবন সব সময় এমনি বিপন্ন ছিল। পার্টির বে-আইনী গুপ্ত কাজের সঙ্গে বাইরের কাজের খুব ভেদ রাখা হত। একজন গা-ঢাকা দেওয়া কর্মীর ঠিকানা ৫ জনের বেশী লোকের জানার নিয়ম ছিল না। আমরা কখনও সোজা পথে হাঁটতাম না, গোয়েন্দার চোখে ধুলো দেবার জন্যে কত অলিগলি অনর্থক ঘুরে মরতে হত। আমাদের প্রত্যেকের ছিল ছদ্মবেশ। আমাদের পার্টির আর্থিক অবস্থা তখন এত সাংঘাতিক যে, কর্মীদের সাংঘাতিক কষ্টে দিন কাটাতে হত। সবাইকেই নিজের হাতে রেঁধে খেতে হত। আমার ও বিয়েটা

কোনদিনই তেমন রপ্ত ছিল না তাই চৌ এন-লাই রান্না করতেন আর আমি জোগাড় দিতাম। উনি অনেক সময় বাড়ী না থাকলে আমি আনাজ কেটে বসে থাকতাম। এলে রাঁধবেন বলে। ক্রমশ উনি আমায় রান্না শিখিয়ে দিলেন।

"যখন আমরা এমনি অবস্থায় আছি, একদিন গা ঢাকা দেওয়া আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভ্য হঠাৎ ধরা পড়লেন। আমাদের সকলের চৌ এন-লাই-এর জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তা হতে লাগল। উনি সময়ে বাড়ী ফিরছেন না দেখে সকলের আর বুঝতে বাকি রইল না যে উনিও ধরা পড়েছেন। সে সময় কথামত বাড়ী না ফেরা মানেই ছিল ধরা পড়ার লক্ষণ। আমি ছুটলাম ওঁর খোঁজে। ভয় হচ্ছিল পাছে না জেনে বাড়ী ফেরেন আর গ্রেপ্তার হয়ে যান। মাকে বলে গেলাম যদি কোন বিপদ হয় যেন জানলার পর্দাটা টাঙিয়ে দেন। সব ঠিক থাকলে যেন খুলে রাখেন। ওঁকে খুঁজে না পেয়ে এক কমরেডের বাড়ীতে রইলাম সে রাতটা। রাত বেশী হওয়ায় দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে বাড়ীর দিকে ছুটলাম। যদি উনি এসে থাকেন। জানলার পর্দা দেখলাম খোলা। তবু ভয় হতে লাগল। উঁকি মেরে দেখি মা কার সঙ্গে কথা বলছেন। দেখতে ঠিক ওঁব মত কিন্তু মাথায় অদ্ভুত টুপি পরা। ফিস্ ফিস্ করে ডাকলাম। হ্যাঁ, উনিই তো বটে। সব কাগজ ডাঁই করে পোড়ানো হল। আমাদের যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে না গিয়ে আমরা আর একজন কমরেডের বাড়ী থাকতে গেলাম। সেদিন আমরা খুব বেঁচে গেলাম। কারণ, যার বাড়ীতে গোড়ায় আমাদের ওঠার কথা ছিল সে সে-রাতে গ্রেপ্তার হয়। পরদিন সকাল এগারোটায় আমাদের বাড়ীতে পুলিশ হানা দিল। মা পুলিশের কাছে অস্বীকার করলেন যে, আমি তাঁর মেয়ে বা আমাদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে। তারপর অনেকদিন আমরা মার খোঁজখবর করতে পারিনি। অনেক বয়েস হয়েছিল। দেখা শুনোর লোক ছিল না।' তাই একবার বহু চেষ্টা করে মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে এক বৌদ্ধ আশ্রমে রেখে এসে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারলাম।

"সাংহাইতে থাকা আমাদের অসম্ভব হয়ে উঠল। বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে আমাদের পালাতে হল। হ্যাংকাওতে যার বাড়ীতে উঠলাম শুনলাম সেও গ্রেপ্তার হয়েছে। তার পরিবারের সঙ্গে আমরা রইলাম।

উনি আমার ওপর এক কঠিন কাজের ভার দিলেন। আমাদের সঙ্গে ছিল পার্টির অত্যন্ত জরুরী দলিলপত্র। উনি বললেন, তখুনি সে সব সরানো প্রয়োজন। রাত তখন দুটো। সমস্ত ছিম্‌ছাম্‌ করে গুছিয়ে নিলাম। একটা রিক্‌সা ডেকে দুরু দুরু চিত্তে চলেছি। দেখি সামনে পুলিশ। রাজনৈতিক কর্মীদের সন্ধানে রাস্তা টহল দিচ্ছে। আমার রক্ত চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। মনে মনে তাড়াহুড়ো করে ঠিক করছি পুলিশকে বলব—বাক্‌সে কিছু নেই কেবল জামা-কাপড় ছাড়া। পুলিশগুলোকে পেরিয়ে গেলাম। তারা কিছুই বলল না। বোধ করি বেশী রাত হওয়ায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যখন বিপদের এলাকা পেরিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছি, তখনও বুকটা ঢিপঢিপ করছিল।"

তেং ইং-চাও এখানে চোখ বুঁজে হেসে উঠলেন। বললেন, "এখনও বুক ঢিপ ঢিপ করছে কিন্তু।" আমরা সকলে হেসে উঠলাম। বললাম, "আমাদেরও একই অবস্থা।" কারণ এমন জীবন্ত করে ঘটনাগুলী উনি বলছিলেন যে মনে হচ্ছিল, পুলিশ আমাদের বাক্‌স ভর্তি দলিল কেড়ে নিতে এসেছে বুঝি।

ক্লান্তভাবে চোখ কুঁচকিয়ে উনি বললেন, "পাঁচ বছর! পাঁচ বছর গা ঢাকা দিয়ে সাংহাই শহরে থাকা এক তিক্ত অভিজ্ঞতা। যদিও এরও অনেক বিচিত্র দিক ছিল। কখনও থিয়েটার বা সিনেমা যাইনি। চৌ এন-লাই এর সঙ্গে কখনও রাস্তায় বার হতে পারিনি। উনি মাঝে মাঝে দাড়ি রাখতেন। আমি লম্বা চুল কেটে ছোট করে ফেলতাম। অসম্ভব অস্বস্তির মধ্যে থাকতে হত সারাক্ষণ। অনেক কমরেড লোভে পড়ে থিয়েটার, সিনেমা যেত। তারা ধরা পড়ত খুব সহজে।

"১৯৩২-৩৪ সালে আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায় সুরু হল। কিয়াংসির ওদিকে তখন আমাদের সোভিয়েট এলাকা। আমাকে সেখানকার কাজে পাঠানো হল। এখানে জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু আমাদের তার জন্যে এতটুকু কষ্ট হত না। মনে আমাদের ছিল অগাধ ফুর্তি আর স্বস্তি। আমরা তখন মাত্র দিনে দুবার খেতাম। কারণ আমাদের লাল ফৌজের জন্যে বাঁচাতে হত। আমরা তেল খেতে পেতাম না। প্রায় দিনই স্রেফ

কচি বাঁশের গোড়া খেয়ে কাটাতাম। যখন খিদেয় আর তিষ্ঠানো যেত না তখন আমরা হাঁটতে যেতাম এই আশায় যে, চলা ফেরায় খিদের কথা মনে হবে কম।

"১৯৩৩ সালে আমাকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার আর সংগঠনের বিভাগে কাজ করতে দেওয়া হল। আমরা তখন সোভিয়েট এলাকা প্রতিষ্ঠিত করেছি বটে কিন্তু সে এলাকাকে বাঁচাতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেও আমরা পেরে উঠছিলাম না। তাই ১৯৩৪ সালে সে এলাকা ছেড়ে আমরা আমাদের বিখ্যাত লং মার্চ স্বরু করি। ১৯৩৩ সালে আমাকে পার্টির সংগঠন-সম্পাদক পদ দেওয়া হয়। কাজের চাপ ছিল অত্যন্ত বেশী। আমি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হই। তাতে অবশ্য আমি মোটেই দমে যাইনি।

কুয়োমিণ্টাং এলাকায় ফেরার কথা ভাবতে পারতাম না। মনে পড়ে যেত সাংহাই-এর সেই জীবন। অনবরত ধর-পাকড়, কমরেডদের ওপর অকথ্য অত্যাচার।"

এই অবধি এসে তেং-ইং-চাও থামলেন। বললেন, "এর পর লং মার্চ-স্বরু। সে তো এক বিরাট কাণ্ড। ওটা বাদ দিয়ে যাই, কি বলো? আর একদিন বলব।"

আমরা হাঁ হাঁ করে উঠলাম, "সে হয় না। আবার কবে স্বযোগ হবে তার ঠিক আছে? আজই একটু কষ্ট করে বলুন। ওটা শোনার আগ্রহই তো আমাদের সবচেয়ে বেশী।"

ঘরে আগুনের তাপ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় তেং ইং-চাও উঠে একটা জানালা খুলে দিয়ে এলেন। ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে লাগল। আমি দোভাষীকে ফিস্‌ফিস্ করে বলে দিলাম, "দোহাই, একটা কথাও বাদ দিও না যেন।"

ওঁর মুখটা গভীর হয়ে উঠল। "১৯৩৪ সাল। আমরা আমাদের ২৫,০০০ লি-র (প্রায় ৬,০০০ মাইল) যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের যাত্রার শুরুতে ছিল ১ লক্ষ লোক। মাত্র ৩০ জন মেয়েকে বাছাই করে নেওয়া হল। পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে সাবধান হতে হয়েছিল। এই ৩০ জন মেয়েদের মধ্যে

ছিলেন কাং কা-চি (চু-তের স্ত্রী), চাই-চাং (চীনের গণতান্ত্রিক নারী সংঘের সভানেত্রী), লি-পা-চাও (বিখ্যাত লেখিকা), আমি ও অন্যান্য মেয়েরা। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, যাত্রার শেষে ১ লক্ষের মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার লোক টিঁকে ছিল। অনেকে মারা যায়, অনেকে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সরে পড়ে। কিন্তু মেয়েরা সেই ৩০ জনই শেষ অবধি টিঁকে থাকে।" তেং ইং-চাও তাঁর কাহিনী শুরু করতে গিয়ে হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, "আজও যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাই। সেই বন, পাহাড়, নদী, পথ—দিনের পর দিন একটানা চলা। মনে হয় যেন কাল ঘটেছে।" উনি চোখ বুঁজলেন। মুখ দেখে মনে হল যে-বিষয়ে উনি বলছেন সে তাঁর অতি প্রিয়, অতি আদরের আর গর্বের। তেং ইং-চাওকে সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু সে-মুহূর্তে তাঁকে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। লং মার্চের অভিজ্ঞতার সৌন্দর্য তাঁর সারা জীবনকে সুন্দর করে তুলেছে। উনি বলতে লাগলেন :

"আমার যক্ষ্মাগ্রস্ত শরীরে এত কষ্ট সহ্য হচ্ছিল না। আমি মুখ দিয়ে রক্ত তুলতে শুরু করলাম। চলার শক্তি লোপ পাওয়ায় আমাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে বয়ে নিতে যেতে হল। একদিন এমন অবস্থা হল যে আমাকে বওয়ার মত লোক মিলল না। আমি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলাম। শরীর খানিকটা সুস্থ বোধ হতে লাগল। তারপর থেকে আমি ঘোড়ায় চড়ে কত বন, কত বরফ-ঢাকা পাহাড় পেরিয়েছি।

"আমাদের এভাবে হেরে যাওয়া এবং সাংঘাতিক পরিমাণ লোক এবং এলাকা ক্ষয়ের কারণ ছিল আমাদের তখনকার ভুল পদ্ধতি। তখন আমাদের ছোট্ট একটুকরো সোভিয়েট এলাকা ছিল। আর ছিল সকলের মনে দারুণ উৎসাহ। সভাপতি মাও আমাদের তখন বারবার বলেছিলেন, সম্মুখ যুদ্ধ না করে গেরিলা যুদ্ধে শত্রুকে ঘায়েল করতে। কিন্তু তখনকার পার্টির নেতৃত্ব অন্য কথা ভাবত। ফলে আমরা প্রত্যহ সমর্থক ও সভ্য হারাতে লাগলাম। কোণঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করলাম। লাল ফৌজ থেকে অনেক সাধারণ-সৈন্য পালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু কর্মীরা তখনও নাছোড়বান্দা। তারা লেগে রইল।

"আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কিয়াংসু থেকে হুনানের দিকে যেতে লাগলাম। সাধারণত রাতে চলতাম আমরা। রাতে চলা সোজা কথা নয়। বিশেষ করে তাদের পক্ষে যারা সৈন্য-জীবনে অভ্যস্ত নয়। শত্রু যে কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করবে তার ঠিক্ ঠিকানা ছিল না। কেউ কেউ এই ধরনের জীবনে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়ত যে তারা কোনরকমে নিজেদের টেনে নিয়ে চলতে লাগল। শুরুতে আমরা নিজেদের মুরোদ সম্বন্ধে একেবারেই সচেতন ছিলাম না। আমরা নিজেদের যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করায় সঙ্গে নিয়েছিলাম ভারী ভারী যন্ত্রপাতি আর জিনিষপত্র। অল্প দিনের মধ্যেই ভুল বুঝতে পেরে সে সবের বেশীর ভাগ পথে ফেলে যেতে হল।

"কখনও কখনও উড়োজাহাজ তাড়া করত আমাদের। একবার হোয়েচো-র ওদিকে বিকেল ৫টা নাগাদ আমরা একটা পাহাড় পেরোচ্ছিলাম। সেদিন বিমান আক্রমণের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সবে যেই পাহাড়ের গোড়ায় পৌচেছি, শত্রু-বিমান মাথার ওপর হাজির। নির্দয় ভাবে তারা বোমা ফেলতে লাগল। একটা ঝোপে ঘোড়াশুদ্ধ আমি আশ্রয় নিলাম। চারিদিকে বন্দুকের গুলি ছুটতে লাগল। অনেক কমরেড আহত হল। অনেকে মারা গেল। কিন্তু আমাদের পথ চলা আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও থামাতে পারলাম না। যারা মারা গিয়েছিল তাদের পথে ফেলে চলে যেতে হল। আমাদের প্রাণ ছিঁড়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তবু আমরা থামতে পারিনি, শোক করতে পারিনি।"

দুঃখে, রাগে তেং ইং-চাও এর গলা বুঁজে এল। চোখ দুটো জলে উঠল। নীচু গলায় গাঢ়-স্বরে বললেন :

"উঃ, কি ভীষণ ঘৃণা করেছি সেদিন কুয়োমিণ্টাং শত্রুকে। আমাদের অতি প্রিয় কমরেডরা পড়ে রইল পথের ধারে। তাদের ফেলে আমাদের চলে যেতে হল। গন্তব্য স্থানে পৌছতেই যে হবে আমাদের!

"তারপর দুর্দিন আরও ঘনিয়ে এল। আমাদের সমস্ত রসদ ফুরুলো। হুনান-হোয়েচো পেরিয়ে আমরা উপজাতিদের এলাকায় এসে পড়লাম। তারা আমাদের আসবার খবরে এত বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, আমরা এলাকায় পৌছে দেখলাম

জনপ্রাণীও নেই। সবাই যে যার ঘর ছেড়ে পাহাড়ে পালিয়েছে। আসলে ওরা আমাদের কুয়োমিণ্টাং-এর জাতভাই ঠাউরেছিল। কুয়োমিণ্টাং-এর সৈন্যরা এ-সব অঞ্চলে অকথ্য অত্যাচার চালাত। যখন তারা আসত, ঘরে ঘরে লুঠতরাজ চালাত। তারা গাঁয়ের দিকে আসছে শুনলেই তাই উপজাতিরা গাঁ উজাড় করে চলে যেত—এমন কি তাদের গম পিশবার ঘানি অবধি সঙ্গে নিয়ে যেত। ফলে আমরা বহু কষ্টে গম জোগাড় করলেও তা ভাঙবার কোন হাতিয়ার পেতাম না। না পেতাম সেই গম রাঁধবার পাত্র। কাজেই আমাদের অন্যভাবে কাজ হাঁসিলের কথা ভাবতে হত। আমরা খুঁজে পেতে বড় বড় পাথর জোগাড় করতাম। সেই পাথরের দুখানার মাঝে গম রেখে হৈ হৈ শব্দে রগড়াতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটত কোনরকমে কাজ চলবার মত করে পিশতে। যদিও বা কখনও একটা ঘানি মিলত, তা টানবার জানোয়ার মিলত না। আমরা নিজেরাই টানতাম।

"ক্রমশ উপজাতির সমস্যা আমাদের পক্ষে খুব জরুরী হয়ে উঠল। তারা আড়াল আবডাল থেকে ইঁট ছোঁড়া, গুলি ছোঁড়া স্বরু করল। আমরা মহা ভাবনায় পড়ে নানা রকম আলোচনার পর ঠিক করলাম কিছু কিছু কমরেডকে ওদের কাছে পাঠাতে হবে। জেনারেল লিউ পুও-চাও গেলেন ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে। প্রথমে উপজাতিদের কায়দায় ওঁকে অঙ্গীকার করতে হল। ওদের সঙ্গে সমান তালে মদ আর খাবার খেয়ে, ঘুমিয়ে আড্ডা দিয়ে তবে ওদের মন টলাতে পারলেন। তারপর থেকে তারা আমাদের আর জ্বালাত না। ক্রমশ ওদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল।"

তেং ইং-চাও গল্পে একেবারে ডুবে গেছেন। ভাবুকদের মত হয়ে উঠেছে ওঁর মুখ। সচরাচর তেং ইং-চাওকে খুব চট্‌পটে কাজের লোক মনে হয়। কিন্তু এখন তিনি যেন অন্য মানুষ।

"জানো," অল্প হেসে শুরু করলেন, "এসময় এত কাণ্ড ঘটত, তার সব পুরোপুরি মনে নেই। অন্তত চোখের ওপর ভাসে না—যদিও একেবারে ভুলিনি। কিন্তু আজও চোখের ওপর ভাসে সেইসব উপজাতিদের মুখ। তাদের মেয়েরা এত সুন্দর।

আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে একটি মা ও মেয়েকে। আমাদের যাবার পথে দাঁড়িয়েছিল। এত সুন্দর যে চোখ ফেরানো যায় না। এমন ভাবে তারা দাঁড়িয়েছিল, এত আকর্ষণীয় ছিল তারা যে, আমি অভিভূত হয়েছিলাম। কোনদিন ভুলবো না তাদের। কিন্তু কি অসম্ভব গরীব এ এলাকার লোকেরা। চীনের উত্তর-পূর্ব সীমানার লোকেরা সাধারণভাবেই অত্যন্ত গরীব।

"কিছুদিন পরে আমরা আর এক উপজাতিদের এলাকায় এসে পড়লাম। সেখানেও সকলে পালিয়েছিল। আর আমাদেরও তেমনি তখন চরম অবস্থা—একটি দানা নেই কোথাও। ফলে কি করি, মাঠের গম কাটতে আমরা বাধ্য হলাম। কিন্তু তা বলে লাল-ফৌজের লোকেরা কখনও বিনি পয়সায় নেবে না গরীবের জিনিষ। আমরা মাঠে মাঠে চিঠি ছড়িয়ে রাখলাম—মাঠের মালিক যেন গমের দাম আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। ঐ সব কাগজগুলো সঙ্গে আনবার জন্যে তাতে অনুরোধ থাকত।

"এখানেও আঁকাবাঁকা পাথরের মাঝখানে গম ফেলে হাতে পিশ্‌তে হত। হাতে ব্যথা ধরত, ফোস্‌কা পড়ত। খাওয়ার মধ্যে যেদিন সবচেয়ে ভাল, সেদিন মিলত বুনো বাঁধাকপির ঝোল, তাও আবার নামমাত্র তেল বা একেবারেই তেল আর নূন ছাড়া। এর যদি পুরো একবাটি পেতাম তো সেদিন আর দেখে কে! ফুর্তিতে হৈ চৈ করে ঘুরে বেড়াতাম আমরা। তখন নুন আমাদের কাছে সোনার চেয়ে দামী। এমন সময় এল, যখন এ খাবার জোটানোও আমাদের পক্ষে অসম্ভব হল। আমরা শেষে চামড়ার বেল্ট, মরা ঘোড়া সেদ্ধ করে খেতে লাগলাম। এমনি নিদারুণ অবস্থায় কিছু হাঁসের দেখা মিলল। দুমাদুম্ যে যা পারল মারল। তারপর গলা অবধি খেল সকলে। বাঁকি যা রইল, সযত্নে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা হল।

"য়ুনানে পৌছে আমদের এই চরম অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে আমরা ঠিক করলাম, স্থানীয় ধনীদের কাছ থেকে কিছু খাবার বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এ অভিযানের যারা প্রথম পংক্তিকে ছিল তারা এত শূয়োর খেয়ে ফেলেছিল যে তাদের সাহায্য করবার জন্যে শেষ পংক্তিকে অবধি তারা সংগঠিত করে সামনে

এনে ফেলল। আমরা সেবার কথায় যাকে বলে কান্‌কো অবধি খাওয়া, তাই খেয়েছিলাম।

"আরও খারাপ সময় এল। আমরা চোরাবালির পাল্লায় পড়ে বহু কমরেডকে হারালাম। এমনি অবস্থায় চৌ এন-লাই একদিন ভীষণ অসুখে পড়লেন। আমি বিশেষ সুস্থ না হলেও ওঁর ভার আমাকেই নিতে হল। কিন্তু একদিন ভীষণ বৃষ্টিতে আপাদমস্তক ভিজে আমার সাংঘাতিক জ্বর এল। অনাহারে, অখাদ্য খেয়ে, জলে ভিজে, আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর অসুস্থ হয়ে পড়ল। কিন্তু আমরা এগিয়ে চললাম। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিশ দিনের ওপর নুন খেতে পায়নি। উঁচু পাহাড় পেরোতে অনেক সময় দেখতাম কোন কমরেডের মৃতদেহ পড়ে আছে। আমি যদিও তখনও ঠিক মরা মানুষ নই তবু তার খুব কাছাকাছি বলা চলে। কিন্তু এই নিদারুণ সংকটের সময় যারা কোনরকমে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলবার মত অবস্থা বজায় রাখতে পেরেছিল তারা টিঁকে গেছে। ধাঁধাঁর মধ্যে দিন কাটত আমাদের। অনেক সময় দূরে কোন পাহাড়কে বেশ ছোট্ট মনে হত। কিন্তু কাছে যেতেই দেখতাম পাহাড় যেন আকাশ ছুঁয়ে আছে। একবার এমনি এক পাহাড় পেরোতে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের চারটি ঋতু ভোগ করার সুযোগ হয়েছিল। পাহাড়ের কোন অংশে দারুণ গরম, যেন গ্রীষ্ম কাল। তারপর হঠাৎ হয়ত কয়েকদিন চলার পর দেখলাম বরফ পড়ছে। কোথাও হয়ত বা চারিদিক আলো করে বসন্তের ফুল ফুটেছে। এই সমস্ত পাহাড় পেরনো দুঃসাধ্য ছিল। পথ এত ভয়ংকর, এক পা ভুল ফেলা মানে নিশ্চিত মরণ। হুচাং, সিং সা-চিয়াং, তা দু-খুও প্রভৃতি নদী ছিল খরস্রোতা। এই সব নদী পেরোনর আগে কিছু কমরেডকে পথ ঘাট জেনে আসবার জন্যে পাঠান হত। তা দু-খও নদী তার রুক্ষতার জন্যে পরিচিত। এমন কি তাই-পিং বিদ্রোহীরা এ নদী পার হতে পারেনি। কিন্তু আমরা পেরেছি। চৌ এন-লাই তখন আমাকে সেইসব বিদ্রোহীদের গল্প বলতে বলতে বলেছিলেন, তখনও নাকি তাদের মধ্যে অনেকে জীবিত ছিল এবং সেই এলাকায় বসবাস করত। এই ক্রুদ্ধ নদী পার হতে অনেক মেহনৎ খরচ করতে হয়েছিল আমাদের। ১৭ জন কমরেডকে প্রথম

পাঠানো হল অগ্রণী বাহিনী হিসেবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাঁতরে ভাঙা সাঁকোর শেকল ধরে ধরে এগিয়ে গেল। তারা এই অবস্থায় তক্তা জুড়তে লাগল, যাতে অন্যেরা ভালমত পেরোতে পারে। এই সমস্ত অভিযানের পর আমরা বাড়ীতে শুয়ে বিশ্রাম করবার কল্পনায় কতই না অস্থির হয়েছি। নদীর এলাকা ছেড়ে আমরা খানিক চলার পর এক নিদারুণ বিপদের মুখোমুখি হলাম। জলের অভাবে সকলে পাগলের মত হয়ে পড়ল। এদিকে গরমও পড়ে গেল বেশ। এমন দিন গিয়েছে যখন এক গণ্ডুষ জলও কারো ভাগ্যে জোটেনি সারাদিনে। এ-অবস্থায় স্নান করার কথা ভাবাও তখন ছিল স্বপ্নের মত। এত কষ্ট যে সে সময় আমরা সহ্য করবার সাহস ও উৎসাহ পেয়েছিলাম তার মূলে ছিল মাও সে-তুং-এর অসাধারণ নেতৃত্ব।

"১৯৩৫-এর জানুয়ারী। চুন-উই পৌঁছে আমাদের একটি সম্মেলন ডাকা হল। আলোচ্য বিষয় ছিল আমাদের পুরনো ভুলের সংশোধন করা। এখানেই স্থির হয় যে, আমরা মাও সে-তুং-এর নেতৃত্ব মেনে চলব। আমাদের সেই সিদ্ধান্ত আজ আমাদের শত্রুকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাস্ত করতে সাহায্য করছে! আমাদের এই নিদারুণ সংকটের সময় চাং কুয়ো-তাও বিশ্বাসঘাতকতা করে কুয়োমিণ্টাং-এর পক্ষে চলে গেল। আমরা সান্সীকে আমাদের সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলাম। আমার পক্ষে 'লং-মার্চ' এক কঠিন কিন্তু অতি আবশ্যকীয় শিক্ষার ক্ষেত্র। কষ্টকে কোনদিনও আমাদের বোঝা মনে হয়নি; কেন না আমাদের ভবিষ্যৎ জয় সম্বন্ধে নিষ্ঠা আর বিশ্বাস ছিল।"

তেং ইং-চাও-এর গলা আবেগে ভেঙে পড়ল। মনে হল বলতে বলতে উনি যেন সমস্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে আবার বেঁচে উঠেছেন।

"না, না, আমরা কখনও মনমরা হয়ে পড়িনি—দু'খানা পাথরের মাঝখানে গম পেশ্‌বার সময়ও নয়। আমাদের হাতে ফোস্কা পড়েছে, খেটে খেটে আমরা অসম্ভব ক্লান্ত হয়েছি, কিন্তু কি আনন্দে যে দিনগুলো কেটেছে! আমি এমন অসুস্থ হয়ে পড়ি, সকলে ভেবেছিল মৃত্যু ছাড়া আমার গতি নেই। কমরেড ওয়াং চিয়া-সিং (এখন মস্কোয় রাষ্ট্রদূত) আর আমাকে ওরা খরচের খাতায় লিখে রেখেছিল।

কিন্তু মজার বিষয় আমরা দুজন যে শুধু সুস্থ হয়ে উঠলাম তাই নয়, আমরা বেশ শক্তিমান হয়ে পড়লাম। শেষে আমার যক্ষ্মা অবধি সম্পূর্ণ সেরে গেল।”

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম “এড্‌গার স্নোর বইয়ে এমনি একটি ঘটনার কথা পড়েছি। সে কি আপনি ?”

“হ্যাঁ আমি।”

“এ যে উপন্যাসের মত !”

“তাতো মনে হবারই কথা।” বলে উনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। লং-মার্চের দিনগুলোর থেকে নিজেকে টেনে আনতে যেন ওঁর কষ্ট হচ্ছে।

মুক্তি-ফৌজ

তেং ইং-চাও এর মুখে মুক্তি-সেনার অপূর্ব বীরত্বের কথা শোনা অবধি মনে মনে ঠিক করলাম এদের বিষয় আরও জানতে হবে। মুক্তি-সেনার অনেকের সঙ্গেই আলাপ ছিল। তাদের কাছ থেকে তত্ত্ব সংগ্রহ করতে লাগলাম। মুক্তি-ফৌজের ইতিহাস, তার কলাকৌশল রীতিনীতি আমার বিশেষ চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। নীচে সংক্ষেপে তার বিবরণী দিলাম।

চীনের মুক্তি-ফৌজের ইতিহাস তার কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই কী অবস্থায় চীনের মুক্তি ফৌজের জন্ম হল তা জানতে হলে কমিউনিস্ট পার্টির জন্মবৃত্তান্ত জানা দরকার।

১৯২১ সালে হ্যাং-চাও প্রদেশে পশ্চিম-সরোবরে এক নৌকোর ওপর ব'সে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তৈরীর পেছনে ছিল গভীর সামাজিক কারণ। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর, জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অংশ চীন গ্রহণ করেছিল। জাপানীরা পুরনো জার্মাণ 'কন্‌সেশন' চুংহও গায়ের জোরে দখল করে বসল। অন্যায় চুক্তির সাহায্যে জাপানীদের এ জায়গা দখল করতে দেওয়ার বিরুদ্ধে দেশে বিক্ষোভ দেখা দিল। যুদ্ধের ফলে, বিদেশী ধনিকদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও, দেশীয় ধনিক শ্রেণী বেড়ে উঠল। এ সময় ১৯১৭ সালে দুনিয়া কাঁপিয়ে রাশিয়ায় সোভিয়েট কায়েম হল। চীনে তার প্রতিধ্বনি এসে পৌছল। সর্বহারা আন্দোলন এক নতুন ঐতিহাসিক মুহূর্তে এসে পৌছল।

এর আগে ১৯১১ সালে সুন ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে এক জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। প্রথম যুদ্ধের আগে চীনের বিপ্লবের চেহারা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক। অর্থাৎ ১৯১১-১৮ সালে যে জাতীয় বিপ্লবের

সূচনা হয় তার নেতৃত্ব করেছে চীনের ধনিক শ্রেণী। তারা তখন ছিল সামন্ততন্ত্র বিরোধী এবং দেশাত্মবোধে সচেতন।

চীন ছিল অর্ধ-সামন্ততান্ত্রিক দেশ; কারণ তার শহরের শিল্পে যে মূলধন খাটত তা সবই ছিল বিদেশীদের। খনি, যানবাহন, সুতোকল, প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিদেশীদের ছিল। বড় শহরগুলো পরিপূর্ণভাবে বিদেশীদের আর গ্রামাঞ্চলগুলো সামন্ত রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। এইসব সামন্ত রাজারা ছিল বিদেশীদের পৃষ্ঠপোষক। তাদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী থাকত, যার সাহায্যে তারা নিরীহ দেশবাসির ওপর অকথ্য অত্যাচার চালাত।

তখন তাই চীনের মূল সমস্যা ছিল—বিদেশী ধনিকদের আর সামন্ত রাজাদের তাড়ানো। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল সমস্ত চীনকে এক করা। চীনের ধনিক শ্রেণী সেই সময় সারা চীনকে এক ক'রে, মার্কিণ গণতন্ত্রের ছাঁচে সরকার বানানোর জন্যে আন্দোলন স্থরু করে।

অক্টোবর বিপ্লব দুনিয়ার সামনে নতুন সম্ভাবনা খুলে দিল। আন্দোলনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনলো চীনের নবজাত কমিউনিস্ট পার্টি। তারা দেশের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্রবাদ-বিরোধী শক্তিগুলোকে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সংগঠিত করার কাজে এগিয়ে গেল। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একথা বুঝেছিল যে চীনের মত পশ্চাদপদ দেশে, এবং এ-হেন আন্তর্জাতিক অবস্থায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে হতে পারে না। হতে পারে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণী ও তার পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে।

সে সময় পার্টির অন্যতম নেতা—চেন-তু-সম্ উৎকট দক্ষিণপন্থী পন্থা বেছে নিলেন। তিনি বললেন, চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চীনের ধনিক শ্রেণীর নেতৃত্বে হবে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি নয়, কুয়োমিণ্টাং বিপ্লবের পুরোভাগে থাকবে। ১৯২৭ সালে পার্টিতে সংকট উপস্থিত হল। কে বিপ্লবের নেতৃত্ব করবে—কোন্ শ্রেণী?

চীনের প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোকের মধ্যে ৫০ লক্ষ শ্রমিক। চীনের ধনিকদের হাতে ছিল সামান্য শিল্প—সিল্ক, সুতো, ময়দা ইত্যাদির কারখানা। কার্পেট,

দেশলাই প্রভৃতি কারখানাগুলো অতি আদিম অবস্থায় চলত। এই ৫০ লক্ষ শ্রমিকের প্রায় সবই বিদেশী মালিকদের কারখানায় খাটত। ১৯২৭ সালে যে সমস্ত বিদেশীদের পয়সা এদেশে খাটত, তার বেশীর ভাগ ছিল ইংরেজ আর জাপানীদের। তবে চীনে পৃথিবীর প্রায় সব সাম্রাজ্যবাদীরাই জটলা পাকিয়ে শোষণ করেছে। তাই যখন কুয়োমিণ্টাং-এর সঙ্গে সামন্ত রাজাদের গৃহবিবাদ শুরু হল, তখন জাপানী, ইংরেজ, মার্কিণ, ফরাসী, ইত্যাদি সব বিদেশীরা সামন্তরাজাদের পক্ষ নিল। তারা তাদের চিরকেলে "ভেদ আন, শোষণ কর" এই নীতির সাহায্যে গৃহবিবাদে উস্কানি দিতে লাগল।

সুন ইয়াৎ-সেন গৃহবিবাদ থামিয়ে চীনকে এক করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি চীনের বিভিন্ন সামাজিক শক্তির তাৎপর্য ও চীনের বিপ্লবের কি ধারা বুঝতে পারেননি, সেহেতু তাঁর পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ল।

কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁর চোখ খুলে দিল। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের কমিউনিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার তাৎপর্য বুঝে দেশকে তিনটি দাবীর ওপর এক হয়ে লড়বার ডাক দিলেন: (১) সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন, (২) কুয়োমিণ্টাং ও কমিউনিষ্টদের কোয়ালিশন (৩) কৃষক ও মজুরদের সর্বতোভাবে সমর্থন।

ইতিমধ্যে ১৯২৪ সাল থেকেই কমিউনিস্ট ও কুয়োমিণ্টাং-এর মধ্যে একটা একতা গড়ে উঠছিল। ১৯২৬ সালে কমিউনিস্টদের সাহায্যে কুয়োমিংণ্টাং সামন্তরাজাদের বিরুদ্ধে তার বিখ্যাত উত্তর অভিযান শুরু করে। ক্যান্টনে এক কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। নানকিং ও সাংহাইকে সামন্তরাজদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। সমস্ত দক্ষিণ চীন জুড়ে শুরু হয়ে যায় ভূমি বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল সামন্তরাজদের হারানো। "খাজনা কমাও" এই ছিল তাদের আওয়াজ।

মাও সে-তুং ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা। কমিউনিস্ট ও কুয়োমিণ্টাং-এর মধ্যে আবার বিবাদ শুরু হল। কার পক্ষ নেওয়া হবে—চাষীর না জমিদারের? যখন

সঙ্কট বেশ জটিল হলে উঠেছে, ১৯২৫ সালে সুন ইয়াৎ সেন মারা গেলেন। চিয়াং কাই-শেক ছিল কুয়োমিণ্টাং দলের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের নেতা। কৌশলে সে নেতা হয়ে বসল। সে এবার আরও পুরোদমে চাষীদের বিরোধিতা শুরু করল। মাও সে-তুং উনানের চাষীদের পক্ষ নিয়ে লড়তে লাগলেন। ১৯২৭ সালে এই সঙ্কট চরমে উঠল। চিয়াং, কোয়ালিশন ভেঙে দেশজোড়া অত্যাচার স্থরু করল। হাজার হাজার কমিউনিস্টকে হত্যা করে সে কুয়োমিণ্টাং-এর কলঙ্ক বাড়াল। কুয়োমিণ্টাং-এর মধ্যে যারা বামপন্থী ছিল তারা চিয়াং-এর বিরোধিতা করতে চেষ্টা করে কিন্তু তাদের দলের নেতা শেষ অবধি লড়তে না পারায় চিয়াং-এর মতামতই বলবৎ হয়।

এই সময় ক্যানটনে এক অভূতপূর্ব্ব সশস্ত্র বিদ্রোহের স্থচনা হল। ১৯২৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর চীনের মাটিতে প্রথম সোভিয়েট সরকার কায়েম হল। ৭ই ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টি এক মিটিং এ দেশে পার্টির যেখানে যেখানে প্রভাব আছে সেখানে সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে ডাক দিল। উদ্দেশ্য ছিল সর্বহারা রাজ কায়েম করা। এই বিদ্রোহে দেশীয় ধনিক শ্রেণীর কোন অংশ বা তাদের সমর্থকরা যোগ দেয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃ-বর্গের মধ্যে তখন ছিল উগ্র বামপন্থী মনভাব। ফলে তারা কুয়োমিণ্টাং-এর শক্তিকে খাটো করে দেখে নিজেদের শক্তিকে বড় করে দেখেছিল। বড় বড় শহরে কমিউনিস্টদের এমন শক্তি ছিল না যে বিরাট মিছিল বা সাধারণ ধর্মঘট ব্যপক ভাবে শুরু করে দেয়। এর ফলে কমিউনিস্টদের সমস্ত সংগঠন ও কর্মীকে নিদারুণ দমন নীতির সামনে পড়ে ছত্রভঙ্গ হতে হয়।

এদিকে শহরে যখন এমনি নীতিতে কমিউনিস্টরা প্রায় মুছে যেতে আরম্ভ করেছে, তখন গ্রামাঞ্চলে মাও সে-তু ও চু-তের নেতৃত্বে এক ছোট্ট লাল ফৌজ সংগ্রাম চালিয়ে চলেছে। লাল ফৌজের তখন শৈশব। মাও সে-তুং-এর বিদ্রোহী চাষী ও চু-তের কুয়োমিংণ্টাং থেকে ভেঙে আনা সৈন্যদের নিয়ে এই ছোট কিন্তু শক্তিশালী বাহিনী। এই ফৌজের নেতাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার নেতৃত্বের, সংগ্রামের কৌশল নিয়ে মত বিরোধ হতে লাগল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির তখনকার

নেতা লি লি-সান বড় বড় শহরে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে জোর দিতে লাগলেন। মাও সে-তুং ও চু-তে বললেন, লাল ফৌজের যে অবস্থা তাতে সহরে বিদ্রোহ চালিয়ে জেতা অসম্ভব। শত্রু স্রেফ অস্ত্রের জোরে কমিউনিস্টদের চুরমার করে দেবে।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক এ-ব্যাপার ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরা লি লি-সানের যুক্তির ভুল দেখিয়ে দিলেন। পার্টির মধ্যে দারুণ আড়োলন শুরু হল। সাধারণ সভ্যরা ভালভাবে কিছু বুঝলেন না। এক নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হল। কমিটির সভ্যরা নতুন নামে পুরনো পন্থা চালিয়ে যেতে লাগলেন। শহরে শহরে তাঁরা ধর্মঘটের ডাক দিলেন। গ্রামাঞ্চলে খোলাখুলি ভাবে কমিউনিস্ট বাহিনীদের কুয়োমিণ্টাং ফৌজের সঙ্গে লড়াই করতে আদেশ দিলেন। এ-নীতি পার্টির সমস্ত শক্তিকে এমনভাবে শত্রুর সামনে তুলে ধরল যে শহরে পার্টি ও তার সংগঠনগুলো শতকরা ১০০% ভাগ ভেঙ্গে গেল। গ্রামাঞ্চলে শুধু শতকরা ৫% ভাগ অবশিষ্ট রইল।

সে সময় ক্যানটনের লোকসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। তার মধ্যে মজুরের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। এ-অবস্থায় শত্রুদের পক্ষে মজুরদের থেকে অন্য অংশকে তফাৎ করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল বিশেষ করে ক্যানটনের আশেপাশে চাষীরা তাদের সমর্থনে জাগেনি ব'লে। লড়াই-এর ভেতর দিয়ে কুয়োমিংটাং-এর তুটো "রেজিমেণ্টে"র ৩০০০ সৈন্য মজুরদের পক্ষে চলে আসে। কিন্তু শত্রুরা এ ক্ষতি অনায়াসে পুরণ করে ফেলে তিন লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ করে। ওদের সাহায্য করতে ইঙ্গ-মার্কিণ-স্যাম্রাজ্যবাদীরা এগিয়ে আসে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওরা কমিউনিস্টদের চেয়ে একশোগুণ শক্তিশালী হয়ে পড়ে। তিনদিনে তারা বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়।

ক্যানটনের সোভিয়েট সরকারকে দাবাবার জন্যে কুয়োমিণ্টাং পাঁচটি অভিযান তৈরী করে। লাল ফৌজের বীরত্বপূর্ণ লড়াই-এর সামনে চারটি অভিযান হটে যায়। প্রধানত নেতৃত্বের ভুলে পঞ্চম অভিযানে লাল ফৌজ হেরে যায়।

ক্যানটনে সোভিয়েট সরকারের পরাজয় থেকে কমিউনিস্টরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করে তা তাদের এক নতুন রাস্তা দেখায়। মাও সে-তুং এর নেতৃত্বে পার্টি

ও লাল ফৌজের পুনর্গঠন হয়। ছোট লাল ফৌজ শৈশব পেরিয়ে বীর বিক্রমে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবার রাস্তা পরিস্কার করে নেয়। লাল ফৌজ যখন আরও বড় হয়, যখন কমিউনিস্টদের পক্ষে গণসমর্থন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠিত হয়, তখন এ ফৌজের নাম দেওয়া হয় গণমুক্তি-ফৌজ। অর্থাৎ, কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হলেও যে কোন স্বাধীনতাকামী মানুষ পুরো অধিকারের সঙ্গে এ সৈন্য বাহিনীতে যোগ দিতে পারবে।

চীনের গণমুক্তি-ফৌজের রীতিনীতিগুলো বড় চমৎকার। এরা সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে যুদ্ধ করতে শিখেছে। সামরিক ইস্কুলে পড়ে যুদ্ধ-বিদ্যা শেখা এদের হয়নি। শুধু যারা, কুয়োমিণ্টাং-এর পক্ষ থেকে চলে আসত, তাদের মধ্যে সামরিক ইস্কুল থেকে পাশ-করা লোক থাকত। গণমুক্তি-ফৌজের লড়াই-এর ইতিহাসকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

চীনের সশস্ত্র সংগ্রামের তিনটি ধাপ ঃ—(১) প্রথম ধাপ, মুখ্যত গেরিলা যুদ্ধ, গৌণত এগিয়ে পেছিয়ে যুদ্ধ (মোবাইল ওয়ার) (২) দ্বিতীয় ধাপ, মুখ্যত এগিয়ে পেছিয়ে যুদ্ধ এবং গৌণত গেরিলা যুদ্ধ। (৩) তৃতীয় ধাপ, মুখ্যত স্থানভিত্তিক যুদ্ধ (পোজিশনাল ওয়ার) এবং গৌণত গেরিলা ও এগিয়ে পেছিয়ে যুদ্ধ।

প্রথম অবস্থায় এরা গেরিলা যুদ্ধ চালাত। বার চোদ্দ জনের ছোট ছোট দল নিয়ে হত একটি গেরিলা বাহিনী। লাল ফৌজের প্রথম অবস্থায় স্থায়ী কেন্দ্রীভূত কোন সামরিক প্রতিষ্ঠান ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টিই সরাসরি এর চালনার ভার নিত। ক্যানটনের অভিজ্ঞতার পর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ চালনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বলে মনে করত।

একটা অঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার কতকগুলো নীতি ছিল। যে সমস্ত জায়গায় সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য ও শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়ত, সে এলাকাকে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হত। এ অঞ্চলের মানুষের মন এমনভাবে রাজনৈতিক শিক্ষার দ্বারা তৈরী করা হত যাতে তারা যে কোন ধরণের আত্মদানের জন্যে রাজি থাকত।

গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার আগে প্রথমে কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত। গোপনে কাজ চালাবার জন্যে কমিউনিস্টদের সংগঠন খাড়া করা হত এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীকে চোর, ডাকাত, দাগী বদমায়েশ ইত্যাদির অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষার জন্যে "গ্রামরক্ষা-বাহিনী" ইত্যাদি গড়া হত। ইতিমধ্যে আরেকটি সব চেয়ে জরুরী কাজ যা করা হত, সেটা হল, অস্ত্র-শস্ত্র জোগাড় করা। গেরিলা যুদ্ধে একটি কথা সব সময় এরা মনে রাখত। প্রথম অভিযান যেন বিফল না হয়। তাহলে পরের অভিযান হাজারগুণ শক্ত হয়ে পড়ে। এ ছাড়া আর একটা জিনিষ মনে রাখতে হত; প্রয়োজন হলে সংঘবদ্ধভাবে পশ্চাদপসরণ করা।

মাও সে-তুং বলেছেন যে গেরিলারা হল মাছের মত আর জনসাধারণ হল জলের মত। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, গেরিলারা তেমনি জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন ছাড়া টিঁকতে পারে না। কারণ তাদের থাকা, খাওয়া, কাজকর্ম সবই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত সে অঞ্চলের অধিবাসীদের ওপর।

এ সময়ে যদি কোন শহরে সাধারণ লোক সব দিক দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে তৈরী হত অথচ তার আশ পাশের গ্রামাঞ্চলে যথেষ্ট শক্তিশালী আন্দোলন না থাকত, তাহলে শহরে সশস্ত্র সংগ্রাম করা হত না। জনগণের লড়াই-এর ইচ্ছাকে নানা ধরণের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জীইয়ে রাখার চেষ্টা হত। মজুর এবং মধ্যবিত্ত কর্মীদের পাঠানো হত গ্রামাঞ্চলে, সেখানে আন্দোলন গড়ে তুলে তবে শহরের সংগ্রামকে উঁচু স্তরে নিয়ে যেতে।

জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর যে সময়, সে সময় ছিল গেরিলা যুদ্ধের সময়। সে যুগে, মাও, গেরিলাদের জন্যে চারটি নীতি তৈরী করেছিলেন, যার জোরে অভিযানের পর অভিযান কমিউনিস্টরা জিততে পেরেছিল।

মাও-এর নীতি :

(১) যখন শত্রু আক্রমণ করে, তখন পিছু হটো।

(২) যখন শত্রু জিরোয়, তাকে বিরক্ত করো। শত্রুর দখল করা এলাকায় বিক্ষোভ সৃষ্টি করো।

(৩) যখন শত্রু চলতে আরম্ভ করেছে, গেরিলা কায়দায় তখন আক্রমণ করো।

(৪) যখন শত্রু পিছু হটে, তখন তাড়া করো।

গেরিলা যুদ্ধ সব সময়ই হত ঝড়ের গতিতে। শত্রু বুঝবার আগেই চক্ষের নিমেষে সব ঘটে যেত। এ ধরণের যুদ্ধে গেরিলাদের পক্ষে দারুণ সুবিধে। কারণ শত্রুর নাড়ীনক্ষত্রের খবর তারা জানে, কিন্তু শত্রু তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; ফলে গেরিলারা নিজেরা আক্রমণ করত, শত্রুকে আক্রমণের সুযোগ দিত না। গেরিলাদের পিছু হটার একটা অভিনব উপায় চীনে ব্যবহৃত হত। যদি কোন এলাকায় শত্রুরা তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলত, যদি পিছু হটার কোন উপায় না থাকত তাহলে ওরা "বাইরের লাইনের মধ্যে ভেতরের লাইন" তৈরী করত। অর্থাৎ শত্রুর বেড়ির ভেতরে নিজেরা বেড়ি বানাত এবং তার ভেতরে ছোট ছোট বেড়ি তৈরী করে শত্রুকে হাজারটা চক্রের মধ্যে ঘায়েল করত।

গেরিলা যুদ্ধের পরের ধাপের যুদ্ধ পদ্ধতি হল এগিয়ে পেছিয়ে যুদ্ধ (মোবাইল ওয়ার)। এ যুদ্ধও বিশেষ করে জাপানীদের বিরুদ্ধে বেশ ভালভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যখন চীনের সশস্ত্র সংগ্রাম এ অবস্থায় এসে পড়ে, তখন গণফৌজ একটি সংগঠিত সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তার তখন নিজের কেন্দ্রীয় সেনাপতিমণ্ডলী তৈরী হয়েছে। কিন্তু তখনও সে শত্রুর চাইতে দুর্বল অর্থাৎ তারা যখন কুড়িয়ে বাড়িয়ে ভাঙা হাতিয়ার নিয়ে লড়ছে, তখন শত্রুর মাল-মশলা একেবারে আধুনিক। সে জন্যে এ ধরণের যুদ্ধে তখনই খোলাখুলি আক্রমণ করা হত, যখন সেই বিশেষ এলাকায় শত্রুর দুর্বলতা সম্বন্ধে এরা স্থির নিশ্চিত।

স্থানভিত্তিক যুদ্ধ (পোজিশনাল ওয়ার) হল এ লড়াই-এর চরম ধাপ। এ ধরণের যুদ্ধ তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন শত্রু সব দিক দিয়ে গণফৌজের চাইতে দুর্বল হয়ে পড়ে। জাপানীরা হেরে যাবার ঠিক পরে কুয়োমিণ্টাং-এর বিরুদ্ধে এগিয়ে পেছিয়ে যুদ্ধ কিছুদিন চলেছিল। লড়াই-এর শেষ দু'বছর শুধু স্থানভিত্তিক যুদ্ধ চালানো হয়। এ যুদ্ধে পরিকল্পনা করে একই সঙ্গে দিকে দিকে সংগঠিত আক্রমণ করা সম্ভব হয়েছিল।

চীনের গণমুক্তি-ফোজের শক্তির উৎস নিঃসন্দেহে সৈন্যদের রাজনৈতিক চেতনা আর দেশপ্রেম। কিন্তু এই গুণগুলোকে বাড়াবার জন্যে এবং প্রতিমুহূর্তে জীবন্ত সংগ্রাম থেকে শিখবার জন্যে মুক্তি-ফৌজকে নানা ধরণের নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়।

গণমুক্তি-ফৌজ তার রাজনৈতিক কর্তব্য হিসেবে প্রথমত চেষ্টা করে সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে একতা গড়ে তুলতে। অর্থাৎ এক ধারে যেমন বিভিন্ন সামরিক দলগুলোকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করা, অন্যদিকে সাধারণ সৈন্য ও অফিসারের হৃদ্যতা গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত ফৌজের সঙ্গে জনসাধারণের গভীর আর নিকট সম্বন্ধ গড়ে তোলা। তৃতীয়ত লড়াই-এর ইচ্ছাকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করা। চতুর্থত শত্রুর ভেতরে ভাঙন এনে দেওয়া। এই রাজনৈতিক কাজগুলো ভালভাবে কার্যকরী করার জন্যে তারা ভালভাবে লড়ত, টাকা পয়সা তুলত; কারণ সে সময় ফৌজের কোন আয়ের বাঁধা-ধরা রাস্তা ছিল না। জনসাধারণকে সংগঠিত ক'রে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ত।

যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ চলে তার জন্যে—গণমুক্তি-ফৌজের মধ্যে ৩টি গণতন্ত্র মেনে চলা হয়: রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সামরিক গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক গণতন্ত্র।

রাজনৈতিক গণতন্ত্র:—প্রত্যেক বাহিনীতে একটি করে সৈন্য-কমিটি আছে। কমিটিতে সৈন্যরা প্রয়োজনমত অফিসারদের ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের সমালোচনা করতে পারে। সৈন্যবাহিনী চালনায় কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ ধরণের সংগঠন প্রত্যেক বাহিনীর সঙ্গে থাকে। কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক কমিসার ও সামরিক অধিনায়কের নেতৃত্বে সমান অধিকার থাকে। অর্থাৎ যুদ্ধ পরিচালনার কাজে দুজনের একমত হওয়া দরকার।

এই সৈন্য-কমিটিতে সেনা-নায়ক, রাজনৈতিক কর্মী, অফিসার সকলেই থাকে। প্রয়োজন বুঝলে কমিটি অফিসার বদলাতে পারে। অকমিউনিস্টরা কমিউনিস্টদের বিশেষ কোন পদ থেকে সরাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তাদের এসব সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মেনে নিতে হয়। এসব মিটিং-এ যুদ্ধে নিজেদের

ভুলচুক ও তা শোধরাবার উপায় আলোচনা করা হয়। এতে গণফৌজ সত্যি সত্যি জণগণের সন্তান হয়ে ওঠে।

সামরিক গণতন্ত্র ঃ—কোন আক্রমণের আগে এবং পরে সৈন্যদের নিয়ে অফিসাররা বৈঠকে বসে। একে বলা হয় যুদ্ধের আগের আর পরের গণতন্ত্র। যৌথভাবে চিন্তার ফল একজনের চিন্তার চেয়ে বেশী দামী। এই সব মিটিং-এ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, জয়-পরাজয়, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হয়। কেউ বীরত্বের দরুন পদক পাবার উপযুক্ত হলে এরাই তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানায়। কলম, ঘড়ি বা ঐ জাতীয় খুঁটিনাটি জিনিষ সৈন্যদের হাতে পড়লে তা এই মিটিং-এ ভাগ হয়। সবচেয়ে যার প্রয়োজন বেশী তাকেই দেবার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ঃ—খরচ খরচার ওপর একটি মাসিক রিপোর্ট সাধারণ সৈন্যদের সামনে দাখিল করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আগামী মাসের একটি বাজেটও পেশ করতে হয়। সৈন্যেরা তাদের প্রয়োজন জানায়—কী পোষাকের তাদের অভাব, কী তারা খেতে চায় ইত্যাদি। সরকার এদের বাজেটমত পয়সা দেয়। চু-তে বলেন, ভাল সুস্বাদু খাবার খেলে তবেই সৈন্যদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে, ফলে তারা ভাল লড়তে পারবে। এই নীতিকে কার্যকরী করা হয়েছে। সৈন্যেরা প্রয়োজন-মত গ্রুপ বানিয়ে যে যার নিজের প্রদেশের রান্না তৈরী করে খায়।

সৈন্যবাহিনীগুলোর মধ্যে আর এক ধরণের "নতুন শিক্ষার" ব্যবস্থা হয়েছে। কুয়োমিণ্টাং-এর কোন সৈন্য মুক্তি-ফৌজের হাতে পড়লে তাকে নিয়ে সভা করা হয়। সভায় সৈন্যটি তার জীবনী বলে।

ক্রমে সে গণফৌজে যোগ দেয়। সবাই তাকে 'মুক্ত সৈন্য' ব'লে ডাকে।

মুক্তিফৌজ ও চাষী

ঘটনাটি চাং-তুং গ্রামে ঘটে। গ্রামখানি ছোট। লোকসংখ্যা প্রায় ৯০০ হবে। শানসী প্রদেশের এই ছোট গ্রামটিতে বহু ঘটনা ঘটে গেছে যা চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এমনি হাজার হাজার গ্রামে লক্ষ লক্ষ চাষী, চীনের নতুন ইতিহাস তৈরী করেছে।

১৯৩৭ সালে চাং-তুং জাপানী দখলে চলে গেল। মুক্ত এলাকা থেকে গ্রামটি মাত্র বিশ মাইলের মধ্যে হওয়ায় জাপানীরা এখানে সামরিক ঘাঁটি বসাল। গ্রামের শেষে তারা পুরু দেওয়ালের দুর্গ তৈরী ক'রে, তার ওপর থেকে গ্রামবাসী আর সীমানার দিকে নজর রাখত। অল্পবয়সী স্বাস্থ্যবান চাষী ছেলেদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে "ট্রেঞ্চ" খোঁড়াত। জাপানী কর্তাদের জন্যে তাদের ফাইফরমাস খাটতে হত। যত অভাবই থাক না কেন তার পরিবারে, একবার কর্তাদের ডাক পড়লে আর অন্য কোন কাজে যেতে পারত না তারা। কখনও বা কোন খামখেয়ালী অফিসার তাদের বন্দুকের গুঁতো দিয়ে বলত, "এই শূয়োরের বাচ্চারা। ঐ লঝঝড়ে বাড়ী দুটো চোখে দেখা যায় না এমন বিশ্রী। ও-দুটোকে ভেঙ্গে ফেলে এখানে নিঃশ্বেস নেবার মত জায়গা করে নিতে হবে। আঃ—ভাব্তেও আরাম।—এই হেট্ শিগ্গির হাত লাগাও" তার হাতের চাবুক লক্লক্ করে উঠত। গুমরানো রাগ চাপতে মজুররা হাতের গাঁইতি, শাবল জোরে চেপে ধরত। একজন অল্পবয়সী মজুরের চোখে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। নিমেষে কোমরে গোঁজা ছোট একখানা ছোরা বাগিয়ে সে অফিসারের পেছনে এসে হাজির হল। পাশ থেকে কে একজন তার হাতখানা চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "বোকা কোথাকার, এখন নয়।"

হাতখানা ছিল চাং-ফু'র। গ্রামের একমাত্র কমিউনিস্ট সে। তার

এ পরিচয় কেউ জানত না ; কারণ, চাং-ফু অতি গোপনে, অভিনব অবস্থার মধ্যে কমিউনিস্ট হয়েছে।

সেদিন মজুররা নিজে হাতে নিজেদের ঘর ভাঙল। মেয়ে আর বাচ্ছাদের চীৎকারের মধ্যে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেদের হাতে গড়া ঘর তারা নিজেরা ভাঙ্‌ল।

কিন্তু তাদের বুকে যে আগুন জ্বলে উঠল, একদিন তা শুধু ঐ অফিসারকে শেষ করে ছেড়ে দিল না—সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত দালালদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিল।

সেদিন যে যার নিজের মত করে তারা প্রতিশোধ আর মুক্তির কথা ভেবেছিল। দেশকে আরও আপন করে ভালবেসেছিল। চাং-ফু'র চোখের দৃষ্টি ছিল মাটির দিকে। ওর ভয় ছিল পাছে ওর চাহনির মধ্যে ওর বিশ্বাস ধরা পড়ে যায়। ওর প্রাণে কে যেন হাতুড়ী পিটিয়ে বলছিল, "খোঁড়্‌, আরও জোরে খোঁড়্‌। তোদের নিজেদের কবর নিজেরা আরও ভাল করে খোঁড় রক্তচোষার দল!"

আর রাতে পাতার খস্‌খসানির মত আওয়াজ আসত গাঁয়ের ঘরগুলো থেকে।

চাং-ফু ঘরে ঘরে আলোচনার বৈঠক বসিয়েছে। তাদের দারিদ্র্য আর অত্যাচারের কাহিনী বলত তারা। চাং-ফু তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার উদাহরণ তুলে বোঝাত কেন এই দারিদ্র্য, কেন এই অত্যাচার। তারা বসে বসে ছোট ছোট কাজের পরিকল্পনা করত। কি করে শত্রুকে দুর্বল করা যায় সে নিয়ে তারা চুপি-চুপি আলোচনা চালাত। আগামী দিনের বড় লড়াই-এর জন্যে চাং-ফু তাদের তৈরী করতে লাগল।

কিন্তু চাং-ফু যে কি করে কমিউনিস্ট হল বা কি করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে বা সে যে কমিউনিস্ট তা কেউ জানত না। সে ছিল ফিরিওয়ালা। মাটির হাঁড়ি কুঁড়ি বেচতে যেত এদিক ওদিক। নিজের গাঁয়ের বাড়ী বাড়ী যেত। অন্য গাঁয়ে তার খদ্দের ছিল। মাঝে মাঝে দেখা যেত সে দুর্গের গা বেয়ে পাহাড়ী পথের দিকে চলেছে। বাঁকে বোঝাই করা মাল। তার চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে নামানো থাকত। দুর্গের ওপর থেকে পাহারাদার সৈন্যটি খানিক লক্ষ্য করে আপন মনে বলত, "ওঃ, সেই গোবেচারী সওদা বেচতে যাচ্ছে।"

(কিন্তু এরা যদি কখনও চাং-ফুর পিছু নিত, দেখতে পেত সে পাহাড় পেরিয়ে পাশের গাঁয়ের দিকে একেবারেই যাচ্ছে না। যাচ্ছে পাহাড়ের ভেতরকার জঙ্গলের দিকে। চলতে চলতে চাং-ফু এবার মাথা তুলে কানখাড়া করে শুনছে আর পাখীর ডাকের মত করে শিষ দিচ্ছে। এমনি পরিবেশে তার কেন কে জানে, খুব ফূর্তি হত। সে আপন মনে হাসত আর শিষ দিত। তারপর হঠাৎ ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসত অল্পবয়সী একটি সৈন্য। লাল ফৌজের কোর্তা পরা। অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে তারা চাপা গলায় কথা বলত। কখনও হয়তো চাং-ফু নতুন হাঁড়ীর ভেতর থেকে সযত্নে রাখা খাবার বার করে তার অল্পবয়সী বন্ধুটিকে দিত।)

এমনি ভাবে যোগাযোগ রেখে সে গ্রামে বিদ্রোহের বীজ পুঁতে, গাঁখানাকে মুক্তির জন্যে তৈরী করতে লাগল। একদিন লাল ফৌজের কর্ত্তারা চাং-ফুকে তারিফ করে ধন্যবাদ দিয়ে পাঠালেন। তার সৈন্য বন্ধুটি তাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, "তাহলে এখন গাঁয়ে পাঁচজন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য আছে? চমৎকার। তাছাড়া বিশ্বাসঘাতক আর ছন্নছাড়া ভবঘুরেরা বাদে গাঁয়ের সব লোকই বলছ লড়াই-এর জন্যে তৈরী? তাহলে এখন আমাদের আরও বড় জাতের কিছু করতে হবে। গাঁয়ের বিশ্বাসঘাতকদের প্রাণে ভয় ঢোকাবার জন্যে মোড়লটাকে শেষ করা দরকার। এতে সাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য বাড়বে। তুমি গাঁয়ের রক্ষী-বাহিনীকে হারাবার যে পরিকল্পনা দিয়েছ তা আমরা আলোচনা করব।"

এর দুদিন পরে চাং-ফু'কে খালি বাঁক কাঁধে নিয়ে গাঁয়ে ফিরতে দেখা গেল। রক্ষীদের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সে সালাম জানাতে ভুলল না। কিন্তু দৃষ্টি তার মাটির দিকে। কিছুদিনের মধ্যে জাপানীদের গা ছম ছম করতে লাগল। ওদের মনে হতে লাগল কি যেন ঘটবে। গাঁয়ে দিনমজুররা খাটে। কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁটে চেপে কাজ করে তারা, কথা কয় না। ছায়ার মত চলা ফেরা করে গাঁয়ের লোক। এমন কি কুকুরগুলো অবধি আজকাল ডাকে কম। রাতে পাতার শব্দে জাপানীরা লাফিয়ে উঠতে লাগল। রক্ষীরা নিজেদের ছায়া দেখে আঁৎকে চীৎকার সুরু করত। কখনও বা দিশেহারা হয়ে দুর্বল স্নায়ুগুলোকে রাশে রাখতে না পেরে অনেকে নিজের

ছায়াকে গুলি করত। দিনের বেলা ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চাষীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখত। চোখ তাদের নামানো। কিন্তু তবু বোঝা যেত কি যেন ঘটবে। ওদের নামানো মুখে প্রলয়ের ইশারা পাওয়া যেত।

গাঁয়ের মোড়ল—জাপানীরা আসার আগে ছিল সাধারণ একজন চাষী। গরীব চাষী হয়েও সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তা গাঁয়ের লোকদের কাছে অসহ্য মনে হত। মোড়লটি বরাবরই লোভী আর দুর্বল প্রকৃতির। গাঁয়ের লোক যে তার ওপর চটা একথা বুঝতে তার বাঁকি ছিল না। এখন সেও তার কর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতে লাগল, বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে। মোড়ল রাতে বাড়ীতে শোয়া ছেড়ে দিল। জাপানীদের শিবিরে অফিসারদের সঙ্গে চারিদিকে পাহারা রেখে সে রাত কাটাতে লাগল। মোড়লের শুধু যে নিজের জীবনের জন্যে ভয় ছিল তাই নয়। সে দুনিয়ার প্রায় সব কিছুকেই ভয় করত আর সবচেয়ে ভয় করত তার বউকে।

চাং-ফু ভ্যাখে এ মহা জ্বালা। মোড়ল চব্বিশ ঘণ্টা থাকে জাপানীদের সঙ্গে। তাকে রাতে একা পেতেই হবে। মনে মনে ফন্দী আঁটে। কি ভেবে চিন্তে সে মোড়লের বাড়ীর দিকে চলে যায়।

মোড়লের বউ চাং-ফুর দূর সম্পর্কে আত্মীয়া। গপ্পে লোক ব'লে একে চাং-ফুকে সবাই ভালবাসে, তায় মোড়লের বৌয়ের পেটে অনেক কথা জমা হয়ে ছিল। সে আপ্যায়ন করে তাকে বসাল। কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর যেন গভীর সমবেদনায় মুষ্‌ড়ে পড়ে চাং-ফু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল—"আচ্ছা—কি যে কখন হয় মানুষের!" বউটি রুখে বলে উঠল, "কি হয়েছে চাং-ফু—ওরকম করছিস কেন? কোন খারাপ খবর আছে?" চাং-ফু করুণ স্বরে বলল, "এর চেয়ে আর কি খারাপ হতে পারে মাসী! হায় হায় রে—। তোমার মত সতীসাবিত্রী যার বৌ—সে কিনা—না, না, আমি বলতে পারবো না, মুখে আনতে পারবো না।" "কি—!"—মোড়লের বৌয়ের চীৎকারে ঘরের দরজাগুলো অবধি কেঁপে উঠল, "শিগ্‌গির বল্, নয়তো তোকে পিটে তক্তা বানিয়ে ফেলব।" চাং-ফু আরও তারিয়ে তারিয়ে বলতে লাগল, "কে জানে

মানুষের কখন কি হয়। পাড়ার কে না জানে মেসোর জন্যে তুমি কী না করেছো। তুমি যখন এত জোর করছ, বলতেই হবে আমাকে। অন্যের মুখে শুনলে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি যে!" ধৈর্য হারা হয়ে মোড়লের বৌ তাকে ঝাঁকানী দিয়ে বলতে লাগল, "বল্ হারামজাদা, কি হয়েছে শিগ্‌গির বল।" চাং-ফু যেন অসহায় হয়ে বলে ফেলল, "সেদিন সেই বদ্ মেয়েমানুষটার বাড়ীর পাশ দিয়ে আসতে আসতে ঘরের মধ্যে চোখ পড়তে দেখি জাপানী অফিসারদের সঙ্গে মেসো সেখানে। শুনলাম রোজ রাতে সেখানেই থাকে। উঃ, বিশ্বাস হয় না—" তাকে শেষ করতে না দিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করতে লাগল মোড়লের বউ, "আসুক মিন্‌ষে আজ বাড়ী, জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো তাকে। তুই বেরো এখান থেকে নয়তো তোকেও খুন করবো।"

চাং-ফু মনের ফূর্তিতে বেরিয়ে গেল। বুঝল ওষুধ ধরেছে। আয়োজন করতে গাঁয়ের কর্মীদের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

পরের দিন সকালে মোড়লের প্রতিবেশীরা দারুণ কৌতূহলের সঙ্গে মোড়লের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সারারাত ধরে তার বউ—মোড়ল বাড়ী এলে কি কি করবে তা ফলাও করে শুনিয়েছে। সেদিন একটু বেলায় ফিরেছে মোড়ল। দরজায় পা দেবার আগেই তার বৌ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর; তারপর যতক্ষণ না ক্লান্ত হল, সমানে মারল মোড়লকে। শেষে তার চুল টানতে টানতে বলল, "যাবি আর জাপানীদের মাগীবাড়ী? আজ থেকে দেখবো কেমন বাইরে রাত কাটাস?" মোড়ল এত হকচকিয়ে গিয়েছিল যে, প্রতিবাদ অবধি করার সাহস ছিল না তার। দু'একবার অসহায় ভাবে কি বলার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হল না।

পরের দিন রাতে মোড়লের ঘরের দোরে দুটো টোকা পড়ল। ঘুমের ঘোরে দরজা খুলে সে দেখল তার বিশ্বাসঘাতক অস্তিত্বকে পৃথিবী থেকে মুছে দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক।

সকালে উঠে জাপানীরা মোড়লের লাস খুঁজে পেল মাঠের মাঝখান থেকে। গাঁয়ের লোক তাদের খুশির ভাব লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট হল। তাদের মুক্তির

আগে সব কিছু গোপন রাখতে তারা শিখেছে। জাপানীরা তাদের দালালদের ওপর আরও কড়া পাহারা বসিয়ে দিনরাত ভয়ে অস্থির হয়ে রইল।

গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে মুক্তি ফৌজের আসার এক বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হল। চারিদিকে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল চাষীরা। কবে, কবে আসবে মুক্তি সেনা? মুক্তি? সে কেমন জিনিষ? কখনও কি সে আসবে?

যেদিন মুক্তি ফৌজ গাঁয়ে পৌঁছল, সেদিন গাঁয়ের চাষী, বুড়ো, বাচ্ছা, মেয়ে—সকলে ছুটে এল তাদের অভ্যর্থনা জানাতে। গাঁ আগে থেকে এমন প্রস্তুত হয়ে ছিল যে, নিমেষে জাপানীরা নির্মূল হয়ে গেল। ঘরে ঘরে রব উঠল—

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি-ফৌজের জয়!

সাংহাই

সাংহাই এক আজব শহর। একদিকে যেমন তার বুকে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে মার্কিনী ঢঙে গড়া "স্কাই স্ক্রেপার" অন্যদিকে তেমনি তার রয়েছে রিক্সাওয়ালা আর মুখ তোব্ড়ানো বস্তি। পিকিংকে দেখলেই যেমন একেবারে চীনের নিজস্ব সহর বলে ভাল লাগে, সাংহাই-কে দেখলে কিন্তু মনটা বিগড়ে যায়। এ যেন কোন চীনে মেয়ে আধুনিক মার্কিণী অভিনেত্রীকে অনুকরণ করে "মেক-আপ" নিয়েছে। লণ্ডনকে দেখেই যেমন মনে হয়েছিল কলকাতার কোথায় যেন একে দেখেছি, সাংহাই দেখেই তেমনি মনে হয়েছিল নিউইয়র্কের এ যেন জাত ভাই।

সাংহাই-এর চেহারা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, এ এক ঔপনিবেশিক দেশের শহর। ঔপনিবেশিক প্রথার সমস্ত লক্ষণ এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। মুক্তির ছ'মাস পরে এ শহরে আমরা যাই। তখনও শহরে পুরনো জীবনের সমস্যাগুলো যেন চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে। মূল সমস্যাগুলো সমাধানের পথে। অনেকগুলো সমস্যায় সবে হাত লাগানো হয়েছে। যুগ যুগ ধরে সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে যে ময়লা জমিয়ে গেছে, মানুষের জীবনকে কুৎসিত করে দিয়েছে, তা একদিনে—বিশেষ করে ৬০ লক্ষ লোকের বসতি যে শহরে—সমাধান হবার নয়। তবু যে নতুন জীবনের সাড়া এখানে আমরা পেয়েছি তা থেকে পরে বুঝতে পেরেছিলাম শুধু চেহারা দেখে সব জিনিষ সম্বন্ধে রায় দেওয়া যায় না।

যেদিন সাংহাই পৌঁছলাম—বেশ রাত হয়েছে। স্টেশনের বাইরে ৫০,০০০ সাংহাইবাসী আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে আর তাদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন মাদাম স্থন ইয়াৎ-সেন। আলোয় আলো হয়ে আছে চারিদিক। হাজার হাজার পতাকা আর পোষ্টার হাতে লোকে নাকি ঘণ্টা দুই শীতে দাঁড়িয়ে আছে। নানকিং থেকে আসার পথে মার্কিণ বোমারু হঠাৎ হানা দেওয়ায় আমাদের

পৌছতে দেরী হয়ে যায়। মাদাম স্থন ইয়াৎ-সেন অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন। তার সঙ্গে সাংহাই-এর মেয়র চেং-হী ও অন্যান্য গণ্যমান্য সরকারী ও বেসরকারী নেতারা। মাদাম স্থন ইয়াৎ-সেন কী অপূর্ব সুন্দরী! চিয়াং কাই-শেকের স্ত্রীকে দেখেছি। এঁর ছোট বোন। কিন্তু চেহারার কী মূলগত তফাৎ। চিয়াং-এর স্ত্রীকে দেখলে মনে পড়ে একটা রংচং করা চীনে পুতুল; কিন্তু এঁকে দেখলে বুক জুড়িয়ে যায়।

পৌছনোর পর চারদিন ধরে সাংহাই-কে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারলাম। কারখানায়, ঘরে ঘরে, শিশু নিকেতনে, স্কুলে, ময়দানে, রাস্তায়, সাচ্চা সাংহাইবাসীদের হদিস মিলল। বুঝলাম, সাংহাই-এর এই যে শাঁখা পরা গেঁয়ো মেয়ের হিল্‌তোলা জুতো-পরা রং করা চেহারা, এর পেছনে রয়েছে একটা বিরাট ইতিহাস, একটা মস্ত বড় সাচ্চা প্রাণ।

সাংহাইতে কি দেখেছি না দেখেছি তা অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে কিছু কিছু লিখেছি। এখানে সাংহাই-এর মেয়র চেং-হীর কাছ থেকে শোনা এ সহরের ইতিহাসের এক পর্ব শুধু তুলে দিচ্ছি।

চেং-হী মুক্তি-ফৌজের অন্যতম সেনানায়ক ছিলেন। সাংহাই তাঁর অধিনায়কত্বে মুক্ত হয়। এখন তিনি সাংহাই-এর মেয়র সাংহাই কি করে মুক্ত হল তার ইতিহাস ওঁর মুখ থেকে যেমন ভাবে শুনেছিলাম তা প্রায় হুবহু তুলে দিলাম:

"সাংহাই-এর মুক্তি প্রসঙ্গে আমাদের সামনে চারটে মূল সমস্যা দেখা দিয়েছিল (১) সাংহাইকে আমাদের হাতে নেবার প্রস্তুতি, (২) সাংহাইকে শাসন করার নীতি, (৩) সাংহাই-এর বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের সাধারণ মনোভাব (৪) শহর মুক্ত করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

"(১) **প্রস্তুতি:** ১৯৪৯ সালের ২৬শে মে সাংহাই মুক্ত হয়। আমরা ফেব্রুয়ারী থেকে প্রস্তুতি শুরু করি। সেই সময় মুক্তি-ফৌজ ইয়াংসী নদী পার হচ্ছে। সাংহাই বা নানকিং-এ আমাদের সামরিক জয়ের কোন সমস্যাই ছিল না। যে সমস্যা আমাদের চিন্তিত করে তুলেছিল তা হল শহরগুলোর শাসনভার নেবার সমস্যা। চীনের কমিউনিস্ট' পার্টির এত বড় শহরের ভার নেওয়া বা শাসন করার

কোন অভিজ্ঞতাই প্রায় ছিল না। তাই খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি জিনিষ আগে থেকে ভেবে নিয়ে আমাদের প্রস্তুত হতে হয়েছিল। আমরা সাংহাই সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব জোগাড় ক'রে তার ভিত্তিতে এক পরিকল্পনা করি।

"আমাদের পরিকল্পনা বানচাল করার জন্যে শহরে প্রতিক্রিয়াশীলরা ফাঁকা প্রচার চালাতে লাগল—"কমিউনিস্টরা যুদ্ধেই জিততে পারে, বড় শহর শাসন করা ওদের কর্ম নয়। একটা শহর চালাবার যে জ্ঞান, তা অর্জন করার ক্ষমতা কমিউনিস্টদের হতে পারে না।"

"শহর শাসন সম্বন্ধে সভাপতি মাও বড় চমৎকার কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, একটা শহরের স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা কয়েক দিনে সম্ভব নয়, কয়েক বছরে সম্ভব। যদিও আমাদের শত্রুরা সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চুড়ান্তভাবে পরাজিত, কিন্তু আজও সাংহাইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তারা বেশ শক্তিশালী। তাদের উদ্দেশ্য আমাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে তলে তলে ভাঙা।

"তাই সাংহাইতে পা দেবার আগে সমস্ত কর্মীদের আমরা বলে দিয়েছিলাম—এ শহর হল কুয়োমিণ্টাং আর প্রতিক্রিয়াশীলদের একটি সমুদ্র। আমাদের সাংহাই ঢোকা তাই হবে অনেকটা সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মত। সকলকে বলা হল—হয়, হেরে গিয়ে সাগরে ডুবে মরতে হবে, নয়তো খুব সাবধানে এগিয়ে সাঁতরে সাঁতরে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক আবর্ত পার হয়ে জিততে হবে।

"হিসেব করে দেখা গেল সাংহাইতে আমাদের পক্ষে রয়েছে ৫টি জ্বলজ্বলে তারা (১) সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের জয়। (২) যে প্রচণ্ড শক্তি গোপনে গোপনে আমাদের পক্ষে কাজ করছিল তাদের মধ্যে ছিল ১০ লক্ষ মজুর ও ৫ লক্ষ ছাত্র। (৩) চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সংযুক্ত মোর্চার নীতি শহরের মধ্যবিত্ত ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীকে আমাদের পক্ষে এনে ফেলেছিল। (৪) দুনিয়াব্যাপী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন। আমাদের ৩০ বছরের লড়াই-এ কখনও এভাবে আন্তর্জাতিক অবস্থা আমাদের পক্ষে হয়নি। (৫) বড় শহর হাতে নেওয়ার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই অর্জন করেছে (মুকডেন প্রভৃতি সহর সাংহাই-এর আগে মুক্ত হয়)।

"সব চাইতে মুশ্‌কিল হল আমাদের চাষী কর্মীদের নিয়ে। বড় শহর তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ কখনও ইলেকট্রিক আলো, ট্রামগাড়ী, লিফ্‌টওয়ালা বড় বাড়ী, মোটর গাড়ী দেখেনি। মজা হয়েছিল সাংহাই পৌছবার পর। আমাদের কিছু চাষী কর্মী ৭ দিনের জন্যে হারিয়ে গিয়েছিল। তারা এত হকচকিয়ে গিয়েছিল যে তারা কে, কোথায় থাকে কিছুই বলতে না পেরে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল। তবু তো আমরা এদের স্থইচ কি করে জ্বালে তা অবধি শিখিয়ে এনেছিলাম।

"ভাল দিকগুলো দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের সামনে বিপদগুলোও তুলে ধরা হত। তাদের বার বার মনে রাখতে বলা হত যে, একশো বছরের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ফলে শহরের গোটা কাঠামোটা সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত। কর্মীদের মধ্যে শত্রুর শক্তিকে ছোট করে দেখার যে ঝোঁক তা আমরা নির্মূল করার চেষ্টা করতাম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের শক্তির উদারণ দেখিয়ে। তাদের আরও দেখান হত কেন ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চালাবার জন্যে আমরা কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পুরোপুরি কায়েম করতে পারছি না এবং আমাদের শহর চালাবার মত টেক্‌নিকাল কর্মীর অভাব থাকায় শত্রুরা তার স্থবিধে নেবার চেষ্টা করবে।

আমাদের ত্রিশ বছরের পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে আমরা ঠিক করলাম যে বরাবর যখন বিপ্লব চরমে উঠেছে—বিদেশী শক্তিরা যেমন তাতে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করেছে এবার তা সম্ভব হবেনা কারণ প্রথমত বিদেশী শক্তিগুলির নিজেদের মধ্যে বিরোধ আর দ্বিতীয়ত সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তিবৃদ্ধি। ১৯২৫ এ যে বিদেশী হস্তক্ষেপ হয়েছিল তার থেকে আজ অবস্থা একেবারে অন্য। আর একটা জিনিষ যা অতীতে কার্য্যকরী হয়েছে তা হল চীনের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার ষড়যন্ত্র। এটাও এবার কার্য্যকরী করা অসম্ভব ছিল। কারণ সাংহাই-এ যে সব বিদেশী ব্যবসাদাররা ছিল তারা গণ-সরকারকে মেনে নেবার ফলে খোলাখুলিভাবে এ ধরনের "বয়কট"-এ লিপ্ত হতে পারবে না।

"এই ছ'-মাসে আমরা দুটি চূড়ান্ত সমস্যা আয়ত্তে এনেছি। প্রথমত কুয়োমিণ্টাং ফৌজকে নিশ্চিহ্ন করা গিয়েছে ; যদিও জানি তাদের গুপ্তচরেরা আজও

সাংহাইতে বেশ জোর বিরুদ্ধ-প্রচার চালিয়ে চলেছে। দ্বিতীয়ত বিদেশী ধনিকদের তলে তলে ভাণ্ডার অবসান আর খাদ্য বস্ত্র সরবরাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত।

"আগে খাদ্যবস্ত্রের জন্যে সাংহাইকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। আগে বিদেশী কাপড় না এলে সাংহাইবাসীর চলত না। এখন সমস্ত কাপড় স্বদেশী। বর্মা, ভিয়েটনাম প্রভৃতি দেশ থেকে চাল না পাঠালে ৬০ লক্ষ সাংহাইবাসীর ঘরে আগে হাহাকার উঠত। এখন আমাদের নিজস্ব চালে আমাদের চলে যায়। কয়লার ব্যাপারেও তাই। আগে কয়লা আনাতে হত উত্তর-পূর্ব চীন থেকে, এখন মধ্য চীন থেকে কয়লা আনাই আমরা। কুয়োমিণ্টাং-এর যত জাহাজ, যানবাহন ও যোগাযোগের কেন্দ্র এখন তা সমস্ত আমাদের। যোগাযোগের নতুন প্রণালী আমরা ব্যবহার করি না; কারণ এসব যন্ত্রপাতি জানে এমন লোক আমাদের কম। সেজন্যে পুরনো-প্রথায় আমরা কাজ চালাই। জানি এসব শিখে নিতে বেশী দেরী লাগে না। যেমন ধরুন, নতুন বন্দুক ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করতে জানতাম না। কুয়োমিণ্টাং-এর অফিসাররা ওপক্ষ থেকে পালিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার পর আমরা নতুন বন্দুক ব্যবহার করতে শিখি। সাংহাইকে ভাল করে জানার জন্যে তাই আমরা সাধারণ-লোকের গুপ্ত ঘরোয়া বৈঠক ডাকতাম। এই ধরনের এক হাজারটি বৈঠকের ফলাফল আমরা সে সময় ছেপে বার করেছি এবং বিশেষ করে সৈন্যদের মধ্যে বিলি করেছি।

"সাংহাই হাতে নেবার আগে এক হাজার কর্মীকে আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ করে নিই। ২০০-৫০০ ছোট-বড় দল তৈরী করা হয়। সাংহাই হাতে নেবার কাজে মজুর শ্রেণীর সাহায্য আমাদের সবচেয়ে বড় সহায় ছিল। সাত লক্ষ মজুর, কর্মী-হিসাবে সাংহাইকে মুক্ত করার কাজে যোগ দেয়। তার মধ্যে চার লক্ষ সরাসরি ভাবে। এই সব কর্মীদের প্রস্তুতির বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা নেওয়া হত। সৈন্যদের রিহার্সাল দিয়ে দেখাতে হত কি করে তারা সাংহাই ঢুকবে, অধিবাসীদের প্রতি কি ধরনের ব্যবহার করবে, কি করে আলো জ্বালবে ইত্যাদি। দমকল, মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদি চালাবার জন্যে যে প্রাথমিক শিক্ষা তা আমাদের কর্মীদের দেওয়া হয়।

"এই সমস্ত বৈঠকে আমরা প্রত্যেক কর্মীর জন্যে বারোটি নিয়ম ঠিক করেছিলাম। যেমন প্রত্যেক কর্মী জানত যে, কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা বা তাতে হাত দেওয়ার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়া কারও থাকবে না। গুদাম বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষে সৈন্য বা অন্য কারো হাত দেওয়া একেবারে কড়াভাবে নিষিদ্ধ ছিল। সমস্ত সৈন্য ও কর্মীদের ওপর দায়িত্ব ছিল শহরবাসীদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করা, তাদের মুক্তির অর্থ বোঝানো ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কাছে সমস্ত বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করা।

"সাংহাই সম্বন্ধে আমরা যে প্রধান ভুলটা করেছিলাম তা হল শহরবাসীদের ওপর নিজেদের প্রভাব আমরা অত্যন্ত বাড়িয়ে দেখেছিলাম। প্রত্যক্ষ অবস্থায় পড়ে তাই আমাদের মধ্যে দুটি ঝোঁক দেখা গেল। কেউ কেউ বা উগ্র গোঁয়ারতুমির সাহায্যে সাংহাইবাসীকে শায়েস্তা করতে চাইল; কেউ কেউ বা একেবারে আত্ম-সমর্পণের পথ বেছে নেবার কথা বলতে লাগল। আমরা এ দুটি ঝোঁকের বিরুদ্ধে রায় দিলাম। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল আস্তে আস্তে দৃঢ়ভাবে এগুবার।

"শহরবাসীদের আমাদের ওপর ক্রমে বিশ্বাস বাড়তে লাগল। আমরা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন শুরু করলাম। গত শরতের তাইফুন-ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়া বাঁধ গড়ে তোলা হল। ফাটকাবাজদের শায়েস্তা করা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, জিনিষপত্রের দাম একটা বাজার দরের মধ্যে এনে ফেলা, মজুর-মালিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা, ইস্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চালু রাখা, যোগাযোগের পথ চালু রাখা—এইসব প্রাথমিক দায়িত্বগুলো আমরা বেশ ভালভাবে পালন করতে পারলাম। আড়াই লক্ষ শহরবাসীকে তাদের পুরনো চাকরীতে বহাল রাখা হল। ৪০ হাজার বিদেশী অধিবাসীকে বিপদমুক্ত রাখার দায়িত্ব সরকার নিল; কিন্তু যারা সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করছিল তাদের উচিত শাস্তির ব্যবস্থা হল।

"এই নীতির পর সাংহাই-এর বিভিন্ন অংশের লোক নিজের নিজের স্বার্থের দিক চেয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগল।

জাতীয় ধনিকশ্রেণী বরাবরই সাম্রাজ্যবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজির চাপে বাড়তে পারেনি। আমরা তাদের স্বার্থরক্ষা করি বলে তারা আমাদের সমর্থন করে।

আমরা অবশ্য তাদের দোষ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। জানি ওরা মুনাফার জন্যে পাগল। কিন্তু ওরা ব্যবসা বোঝে। টেক্‌নিশিয়ান, ইন্‌জিনিয়ার, বিদেশে পড়ছে এমন ছাত্র, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, চাকরীজীবী—এদের প্রতি সরকার যোগ্য সম্মান দেখিয়েছে। এদের খুব উঁচুদরের টেক্‌নিকাল জ্ঞান থাকায় সাংহাই-এর শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার কাজে এরা অপরিহার্য (চীনের মধ্যে সাংহাইতে এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী)। এরা মূলত গণ-সরকারকে মানে ; কিন্তু নিজেদের আত্মম্ভরিতায় শ্রমিকশ্রেণীকে নিচু চোখে ত্যাখে। আমরা এদের ধৈর্যের সংগে বদলাবার চেষ্টা করছি। আমাদের সমর্থকদের মধ্যে বেশ জোরদার হল পাঁচ লাখ ইস্কুল কলেজের ছাত্র। তারা মার্কসবাদ লেনিনবাদ সাগ্রহে শেখে। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ জমিদার বা ধনিক শ্রেণী থেকে আসায় তাদের কতকগুলো মারাত্মক দোষ আছে। এ ছাড়া ৮ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বাস্তুহারা আর গরীব শহরবাসী আমাদের পক্ষে। তাদের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে আমাদের সমর্থন করা অসম্ভব। তারা সমর্থন করে এই কারণে যে, কুয়োমিণ্টাং আমলে তারা যে লাথি ঝাঁটা খেত, তা আমাদের আমলে তো নেইই—বরং আমরা তাদের আইন দিয়ে নানা ভাবে রক্ষা করি। তাদের বদলাবার জন্যে পাঠচক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

"সাংহাই-এর দশ লক্ষ মজুর হল আমাদের শিরদাঁড়া। বিশ বছর ধরে কমিউনিস্ট পার্টি এখানে মজুর শ্রেণীর মধ্যে কাজ চালিয়ে গেছে। তাই মুক্তির সময় সাত লক্ষ মজুর সাংহাই-এর ব্যবস্থাপনার কাজে অংশ নিয়েছিল। মুক্তির ফলে তাদের রাজনৈতিক ও মানসিক অবস্থা আরও উন্নত হয়েছে। তারা আরও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছে, কারণ তারা জানে সরকার তাদের, চীনকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করবার দায়িত্ব মজুর শ্রেণীর।

"শহরবাসীদের মধ্যে আর একটি অংশ হল—বিদেশী ধণিকশ্রেণী। তারা বিরাট সম্পত্তির মালিক। সরকারকে গোড়ায় বিশ্বাস করেনি। পরে মেনে নিয়েছে। এদের মধ্যে যারা বেইমানি করার চেষ্টা করেছে তারা উচিত শাস্তি পেয়েছে। এরা সাম্রাজ্যবাদীদের অবরোধ নীতির বিরুদ্ধে, কারণ তাতে ওদেরই ব্যবসার ক্ষতি হয়।

এরা আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস করে না, কারণ এরা আমাদের জনসমর্থনের কথা জানে।

"তাই সাংহাইকে মুক্ত করা যত না কঠিন হল, তাকে শাসন করা তার চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে পড়ল। কমিউনিস্ট পার্টি, সংযুক্ত মোর্চার মতামত না নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয় না। সংযুক্ত শক্তিই আজ আমাদের সবচেয়ে বড় আশা।

"আমরা বিনয়ের সঙ্গে শেখায় বিশ্বাস করি। যা জানি না, তা জানার ভান করি না। যদি অল্প জানি তবে অল্প করি। যদি কোন বিষয় কিছু না জানি তবে সে বিষয়ে কিছু করি না। আমরা বড় সমস্যাগুলোকে আগে সমাধানের চেষ্টা করি। শত্রুকে একে একে নিঃশেষ করার নীতি হল আমাদের নীতি। যে কোন সমস্যাকে আগে তলিয়ে না দেখে তাতে আমরা হাত লাগাই না! দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটিও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুশীলনের ভিত্তিতে আমরা সমাধানের চেষ্টা করি।"

মজুর

সভাপতি মাও বলেছেন, "বাধা আছে, কিন্তু সে বাধা আমরা অতিক্রম করতে জানি। তাই আমাদের আশা আছে।"

এই মনোভাবটা বিশেষ করে চীনের মজুরদের মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয়। সরকারী বা কারো ব্যক্তিগত কারখানায়, যেখানে যেখানে আমরা গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি মজুররা বিপুল আশার সঙ্গে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আছে। তাদের এই আশার সূত্র হল তাদের নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে তাদের চেতনা।

চীনের ভবিষ্যৎ, তার অর্থনীতিক আর সাংস্কৃতিক বিকাশ, খুব বেশী অংশে তার মজুর শ্রেণীর ওপর নির্ভর করছে। কারণ এরাই আজ চীনকে শিল্প-প্রধান ক'রে তোলার পথে সবচেয়ে বড় সহায়। এদের হাতেই দেশের চাবিকাঠি। চীনের অর্থনীতি আজ ধূলিসাৎ। ভাঙা ঘরের ভিৎ থেকে প্রাসাদ গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছে তাই চীনের পঞ্চাশ লাখ মজুর।

চীনের মজুরদের ভালভাবে জানার সুযোগ মিলল প্রথম সাংহাই-তে। বিপ্লবের ছ'মাস পরে আমরা সাংহাই গিয়েছিলাম। ক্যান্‌টনের ওদিকে তখনও যুদ্ধ চলেছে। তিব্বতের পাহাড়ে পাহাড়ে মুক্তি ফৌজ এগিয়ে চলেছে। নানকিং থেকে রাতে রওনা হতে হল, কারণ দিনে নাকি মার্কিণ বোমারুদের উৎপাতের আশঙ্কা আছে। ইয়াংসির কাছে সবে পৌঁচেছি, তখন ভোর রাত, আকাশে দেখা দিল মার্কিণ বোমারু। দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে রেলের মজুররা এগিয়ে এল। নিমেষে তারা আমাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে কাজে ফিরে গেল। শুনলাম এদের মধ্যে অনেকে সেই বিখ্যাত "ইয়াংসি অতিক্রম"-এর রাতে অসীম সাহসের সঙ্গে লড়েছিল। আমরা বার বার অনুরোধ করে পাঠালাম, বোমারুরা চলে গেলে অন্তত একজনের সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই।

কিন্তু আমাদের নিরাপদ করার জন্যে সকলে এমন মরিয়া হয়ে উঠল যে তাদের ধরবার আশা রইল না। নানকিঙে থাকতে সুন-ইয়াৎ-সেনের স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে সামরিক বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র-ছাত্রী আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল। তাদের মধ্যে একজন চোদ্দ বছরের কিশোর মজুরের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সে "ইয়াংসি অতিক্রম"-এর রাতে গুলি-গোলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নৌকোর কিনার ধরে ইয়াংসি পার হয়েছিল। ইয়াংসির উন্মত্ত ঢেউ-এর মধ্যে সেদিন কত লোক তলিয়ে গিয়েছে। চারিদিকে হু হু করছে আগুন। আগুন, গোলাগুলি আর বুকফাটা চিৎকার! কোথাও বা কুয়োমিণ্টাং সৈন্য আর অফিসাররা উন্মাদ হয়ে আশে পাশের গাঁয়ের অধিবাসীদের দিকে গুলি করতে সুরু করেছে। চিৎকার করে পড়ে গেছে মা। কোলের বাচ্ছা দুহাত বাড়িয়ে কাঁদছে। চারিদিকে আগুন, গুলিগোলা, চীৎকার! তা অগ্রাহ্য করে, বুকের ওপর ভর করে গুঁড়ি গুঁড়ি এগোচ্ছে একটি চোদ্দ বছরের মজুর। ঐ বাচ্ছাকে নিরাপদে নিয়ে যেতে হবে। তারপর ইয়াংসি পার!

ইতিহাস সেদিন দুর্বার বেগে ইয়াংসি পার হল। ইয়াংসির জল লাল হল মানুষের রক্তে। গাঁ গুঁড়িয়ে গেল, সাঁকো ধ্বসে পড়ল, আর বিশ্বাসঘাতকের মাথা লুটিয়ে পড়ল মুক্ত মাটির ওপর। সেদিন ইতিহাসকে চালাচ্ছিল যে মানুষরা তাদের মধ্যে একজন ঐ চোদ্দ বছরের মজুর। তার বুকে ঝক্‌ঝকে পদক ঝুলছে—ইয়াংসি পার হওয়া বীরদের পংক্তিতে তার জায়গা। তার সঙ্গে আমার চলতে চলতে পরিচয়। কথা বিশেষ হয়নি। মাথায় সে সাড়ে চার ফুট লম্বা হবে। মুখে একটা অবাক ভাব। দেখলে মনে হয় খুব জোর দশ বছর বয়েস। আমার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে এক গোছা ফুল গুঁজে দিল! তারপর সে এমন সংক্রামকভাবে হাসতে লাগল যে, আশে পাশের সকলেই তার হাসিতে যোগ দিল। জিজ্ঞেস করে জানলাম ছেলেটি এখন সামরিক স্কুলের ছাত্র। এখন আর তাকে ইয়াংসির ধারে দুটো পয়সার জন্যে বড় লোকদের মোট বইতে হয় না।

আমরা সাংহাই পৌঁছলাম। সেখানে বহু সরকারী ও বেসরকারী কারখানায় মজুরদের সঙ্গে আলাপ হল। মায়েরা গর্বের সঙ্গে বলল, "আগে অন্তঃসত্ত্বা হলে

অনেক ক্ষেত্রে আমাদের চাকরী যাবার ভয়ে পেটের বাচ্ছা নষ্ট করে ফেলতে হত। আজ আর মা হতে আমাদের ভয় নেই। এই যে শিশুরক্ষণাগার দেখছ, এখানে এখন শিক্ষিতা দাই-এর হাতে বাচ্ছা রেখে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে যেতে পারি। এতে আমাদের যে শুধু মন নিশ্চিন্ত হয়েছে তাই নয়। আমাদের কাজের ক্ষমতাও বেড়েছে। তবু তো শুধু ছ'মাস হল আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই তো সবে স্বরু।" একজন গোলগাল মজুর মেয়ে আমাদের ঘুরিয়ে তাদের সুতো-কল দেখাচ্ছিলেন। তিনি এখানকার ট্রেড ইউনিয়নের নেত্রী। দেখলাম এক একটা কলের গায় লাল সাটিনের পতাকা ঝুলছে। যাদের কলে এমনি পতাকা ঝুলছে তারা হল মজুর বীর। তারা সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতায় জিতেছে। কারখানায় কারখানায় দলবদ্ধ-ভাবে এই সমাজতন্ত্রী প্রতিযোগিতা মজুরদের মধ্যে "উৎপাদন বাড়াও" আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে! যে মজুর মেয়েটি আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তিনি হঠাৎ দোভাষীকে কী বললেন। তারপর "ক্ষমা করবেন" বলে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। শুনলাম উনি পাঁচ ছেলের মা। শেষেরটির বয়েস মাত্র তিনমাস। এখনও মায়ের দুধ খায়। তাই উনি বাচ্ছাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে কাজের মাঝে ছুটি পান। কি স্বাভাবিক হয়ে উঠছে এদের জীবন! মনে পড়ল বাংলা আর আসামের মজুর মায়েদের। যারা মাঠের মাঝে খোলা আকাশ আর জঞ্জালের মধ্যে সন্তানের জন্ম দেয়। যারা বাড়ন্ত বাচ্ছাকে আপিং খাইয়ে ভাঙা বস্তিতে ফেলে কাজে যায়। যারা দিনে বারো ঘণ্টা খেটেও বাচ্ছাকে পেটভরে খাওয়াতে পারে না। ধিক্কারে ভরে ওঠে মন। আমাদের দেশে কি অসহ্য অপমান শ্রমের। কি অসহ্য অপমান মাতৃজাতির। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই দেশকে—সেখানে মাকে মা বলে গর্ব আর সম্মান করে একটা সমগ্র জাতি আর তার গণ-সরকার।

সাংহাই-তে বিপ্লবের ছ'মাসের মধ্যে—শিশুরক্ষণাগারের সংখ্যা হয় ৪৮ থেকে ১০৮। মজুরদের মজুরী নগদ পয়সার দিক থেকে তখনও বিশেষ বাড়েনি। কিন্তু তাদের মজুরীর মূল্য খাদ্যের পরিমাণে নির্ধারিত হওয়ায় তারা আগের চেয়ে অনেক ভালভাবে থাকতে সমর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ ধরুন যদি একজন মজুরের মাইনে হয় দেড়মণ চালের টাকা তো চালের দাম যতই বাড়ুক বা মুদ্রাস্ফীতির দরুণ পয়সার দাম

যতই কমুক, সে ঠিক বাজার দরটা নগদ টাকায় মাইনে হিসেবে পেয়ে যাচ্ছে। যখন আমরা চীনে, তখন একজন মজুরের মাইনে গড়পড়তায় ৬।৭ পিকলের মত (১৩৩ পাউণ্ডে এক পিকল)। হিসেব করে দেখা যায় তখনকার বাজারদর অনুযায়ী তাদের মাইনের মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ১২০৲ টাকার মত। এতে একটা পরিবার সচ্ছলভাবে থাকতে পারে। এতে আগের মত প্রত্যহ অনাহারের আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে থাকতে হয় না মজুরদের।

একজন বৃদ্ধ মজুর আমাদের দলের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কি যেন বলতে চান। আমাদের দলের ফরাসী বান্ধবী বললেন, "কই, মাইনে তো তেমন বাড়েনি!" একটা প্রশান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল তাঁর ভাঁজ খাওয়া মুখে। শিশু ভোলানাথের মত সরল সে হাসি। বললেন, "কিন্তু আমরা স্বাধীন যে—গরীব কিন্তু স্বাধীন।"

স্বভাবতই সরকারী কারখানাগুলো ব্যক্তিগত মালিকদের কারখানাগুলোর চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। বেসরকারী কারখানাগুলোয় সরকার মজুর-মালিক বিরোধের সমাধানের নানা গঠনমূলক চেষ্টা করেছেন। সরকারী চাপ স্বভাবতই মজুরদের পক্ষে, তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর জন্যে। মালিকরা পুরনো কায়দায় শোষণ চালাবার নীতি থেকে দিন দিন বঞ্চিত হচ্ছে। সরকার মালিকদের মুনাফার লালসাকে সংযত করে তাকে উৎপাদন বাড়াবার দিকে উৎসাহ ও চাপ দিচ্ছে। এমন কি সেই সমস্ত ব্যক্তিগত মালিককে সরকারী সাহায্য অবধি দেওয়া হচ্ছে যারা জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিষ তৈরী করে।

ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ওয়াং বলছিল, "আর আমরা যারা অল্পবয়সী, মুক্তি ফৌজের সাংহাই ঢোকাকে অভ্যর্থনা জানাতে আমরা শক্ত করে জানলা আটকে চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে গানের রিহার্সাল দিতাম। একটু শব্দ বাইরে যাবার উপায় ছিল না। কারণ রাস্তায় রাস্তায় কুয়োমিণ্টাং সৈন্যরা আমাদের কমরেডদের তখন গুলি করে মারছিল। তাদের মৃতদেহে রাস্তা ছেয়ে থাকত। কিন্তু আমরা জানতাম মুক্তি আমাদের দোর-গোড়ায়, মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি পেরিয়েছে। যেদিন মুক্তি ফৌজ এল, আমরা কি আনন্দে চীৎকার করেছিলাম আর কি দুঃখে আমাদের প্রাণ ছিঁড়ে যেতে চেয়েছিল সেই সব

কমরেডদের জন্যে যারা বিপ্লবের জন্যে লড়েছে কিন্তু জয় দেখতে পেল না।" সাংহাই-এর ষাট লক্ষ অধিবাসীর মুক্তির লড়াই-এ মজুর শ্রেণী ছিল সবার আগে। খোলাখুলি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন চীনের কুয়োমিণ্টাং এলাকাগুলোয় ছিল না। ছিল মজুরদের গুপ্ত সংগঠন। তারা সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে চলত। আমরা যখন সাংহাইতে ছিলাম তখন সেখানকার দশ লক্ষ মজুরের মধ্যে আট লক্ষ নতুন সভ্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মধ্যে এসেছে। তখন ট্রেড ইউনয়নের স্থায়ী সংগঠন হয়নি। এই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোই মজুরদের দাবী দাওয়া নিয়ে কারখানায় কারখানায় চেতনা জাগাচ্ছে। তারা হাজার হাজার ছোট ছোট পাঠচক্রের সাহায্যে যেমন একদিকে নিরক্ষরদের লিখতে পড়তে শেখাচ্ছে, তেমনি অন্য দিকে তাদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করে তুলছে।

মুক্তি ফৌজকে সাংহাই-এ নিরাপদে পৌছানোর জন্যে যে প্রস্তুতি, তাতে এখানকার মজুর শ্রেণীর দান অপূর্ব। কুয়োমিণ্টাং সরকার নিজের পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পেরে আওয়াজ তোলে—"কারখানা ভাঙো, তার দামী কলকব্জা খুলে তাইওয়ান নিয়ে চলো।" এদিকে এর পাল্টা জবাব হিসেবে নিখিল চীন লেবার ফেডারেশন তার ষষ্ঠ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে: "বড় শহরে কারখানা ও জাতির সম্পত্তি বাঁচাতে কুয়োমিণ্টাং-এর আক্রমণ আটকাতেই হবে।"

সাংহাই-এর মজুররা এর জন্যে "জনগণের শান্তিরক্ষা বাহিনী" তৈরী করল। তাতে মজুররা ষাট হাজার মেয়েপুরুষকে সংঘবদ্ধ করল।

কারখানার যন্ত্রপাতি খোলার জন্যে সৈন্য পাঠাল কুয়োমিণ্টাং। রাস্তায় মজুরদের বাহিনী মোতায়েন। সৈন্যরা পৌছতেই মজুররা গোল হয়ে তাদের ঘিরে ফেলল। সৈন্যরা এই বিরাট বাহিনীর সামনে ঘাবড়ে গিয়ে শুধু কিছু তৈরী মাল নিতে চেষ্টা করল। হুঙ্কার উঠল: "না একটা সুতোও নয়।" চীনা কাপড় কলে শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। মজুররা বলল, "দেখাচ্ছি,"—বলে তাদের ছেলে-পুলে বউ, মা, সকলকে নিয়ে কারখানা সামলাতে বসল। অনেক ক্ষেত্রে কারখানার মালিকরা মজুরদের সঙ্গে একজোট হয়ে কারখানা রক্ষার কাজে যোগ দিল। ইংরেজদের ডক সামলাতে কুয়োমিণ্টাং দু'হাজার রক্ষী পাঠাল। "জনগণের শান্তি-

রক্ষা বাহিনীর" বারো জন নেতা সেই রক্ষীদের সঙ্গে আলাপ করতে গেল। পনেরো জন কর্মী সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে প্রচারের জন্যে নির্বিবাদে ঢুকে পড়ল। ১২ ঘণ্টা ধরে আলাপ আলোচনা চলার পর, সৈন্যরা হাতিয়ার ফেলে দিয়ে বলল, "হাত মেলাও।" এমনিভাবে কারখানায়, রাস্তায়, ঘরে, বাইরে সাংহাইকে মজুররা মুক্তির জন্যে প্রস্তুত করে তুলেছিল।

চীনের ভারী শিল্পের কেন্দ্র হল মাঞ্চুরিয়া। মুকডেনের আনসান লোহা ও ইস্পাত কারখানা চীনের শিল্পজগতের প্রধানকেন্দ্র। মুকডেনে যেদিন পৌছলাম, তার পরের দিন ভোরের ট্রেনে আমরা আনসানের দিকে রওনা দিলাম। প্রায় দু ঘণ্টা পরে চোখে পড়ল বড় বড় দৈত্যের মত চুল্লী—ব্লাস্ট-ফার্নেস, কারখানার লম্বা লম্বা চোং আর ঘর বাড়ী। সব শান্ত স্তব্ধ হয়ে যেন এই আধা কুয়াসার সকালে ইস্পাতের সহর আনসানের পরিবেশে ঝিমুচ্ছে। কিন্তু কারখানার কাছে পৌছতে দেখলাম, কোথাও ঝিমুনোর কোন চিহ্ন নেই। সমস্ত জায়গাটা লোহা লক্কড়ের ঝনঝনানি আর মানুষের গলার শব্দে সরগরম হয়ে আছে।

এই বিরাট জ্বলন্ত ফার্নেস্‌গুলোর পাশে চীনের শ্রমবীরদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল। তারা নতুন চীনকে গড়বার জন্যে হাজার হাজার টন ইস্পাত সৃষ্টি করছে।

এই কারখানাগুলো আগে ছিল জাপানীদের। তারপর কুয়োমিণ্টাং-এর। এখানে যে মজুররা ইস্পাত তৈরী করে তাদেরই মারবার তারা অস্ত্র বানাত। শ্রমবীর বলে কোন কথা ছিল না তাদের অভিধানে। মজুররা ছিল ঘানির বলদ। চোখ বেঁধে শুধু টানবে।

চূড়ান্তভাবে হারবার আগের মুহূর্তে রাগে অন্ধ হয়ে কুয়োমিণ্টাং সরকার এ-কারখানার বেশীর ভাগ অংশ ধ্বংস করে দিয়ে যায়। মজুররা সেই ভাঙা কারখানা একে একে জোড়া লাগায়। তারা নিজেরাই উৎসাহ করে ভাঙা যন্ত্রপাতি খুঁজে বার করে। মাটি থেকে লোহালক্কড় টেনে তোলে।

আমরা যেদিন পৌছলাম সেদিন এমনি তিলে তিলে জোড়া লাগানো একটি ব্লাস্ট-ফার্নেস চালু করা হবে বলে শুনলাম। কুয়োমিণ্টাংরা যখন যায় তখন সব ফার্নেস

নিভে ছিল। এখন সাতটা ফার্নেস জ্বলছে! ইস্পাত চাই—চীনকে গড়তে ইস্পাত চাই।—

গোটা পাঁচেকের সময় আমরা ব্লাস্ট-ফার্নেসের পাশে উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি আমরা নতুন চীনের মজুরের হাতে ইস্পাতের জন্ম দেখতে।

ট্যাপ্-হোলের দু'ধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে মজুররা। ফার্নেসের ঠিক গায়ের কাছে, যেখান দিয়ে লোহা বেরুবে, তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে এদের নেতা। কারখানার শ্রেষ্ঠ মোল্ডার সে। তার মুখে মুখোস লাগানো। হাতে লম্বা একটা লোহার রড্ লক্‌লক্ করছে। আঘাতের পর আঘাত করছে—ফার্নেসের দরজায়—যা খুললে বেরুবে কাঁচা লোহা।

আশ্চর্য কর্মপদ্ধতি মজুরদের। আমি গুণে গুণে দেখছিলাম। পালা ক'রে ক'রে কেমন তারা দরজা পেটাচ্ছিল। হয়তো সাতবার মেরেছে, পাশের মজুর তার হাত থেকে রড্ টেনে নিয়ে মারতে শুরু করল। এমনিভাবে দেখছিলাম সকলে ঠিক জানে কোন্ মজুর ক'ঘা মারতে পারে, কার শক্তি কতটুকু। তাদের এই কাজ করার ধরণ মজুর শ্রেণীর বিচার বুদ্ধির উৎসকে আমাদের সামনে পরিস্কার করে দিয়েছিল। তারা যৌথ সৃষ্টির এক অপূর্ব ছবি আমাদের সামনে সেদিন তুলে ধরেছিল। মনে পড়ল কলকাতার ডক মজুর ইউসুফের কথা। কি শক্তি ছিল তার দু'খানা হাতে। সেও এমনি যৌথ সৃষ্টির নায়ক ছিল। তফাৎ হল—ইউসুফকে সৃষ্টি করতে হত পায়ে বেড়ী পরে। তার হাত দু'খানা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত না। তাই যন্ত্ররাজ ইউসুফ্—ভারতবর্ষের গর্ব—যক্ষ্মায় প্রাণ হারাল।

"লোহা, লোহা" "লোহা, লোহা" চারিদিকে রব উঠল। গলা আগুনের মত ছুটে বেরিয়ে এল লোহা। মুখোস সরিয়ে দলের নেতা কপালের ঘাম মুছতে লাগল। বড় বড় দৈত্যের মত ফার্নেসের পাশে কতটুকুই বা এই মানুষগুলো! কিন্তু কি তাদের শক্তি! যৌথ সৃষ্টির এই বিরাট, ব্যাপক আর মুক্ত রূপ আমাদের সেদিন মুগ্ধ করেছিল।

সেদিন এইসব মজুরদের ঘরে ঘরে আলাপ জমাতে গেলাম। কারখানা থেকে বেরুচ্ছি, দেখি মস্তবড় প্রাচীর পত্রের সামনে ভীড করে অনেকে পড়ছে। প্রাচীর

পত্রে রয়েছে নানা আলোচনা, একজন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ঐ যে দেখছ ছবি, ও হল ওয়াং ওয়ান্-খুর। ওকে এ অঞ্চলের সকলে চেনে। ওই প্রথম কুয়ো-মিণ্টাং-এর ভাঙা কারখানা জোড়া লাগানোর কাজে অগ্রণী হয়। ও একটা দল তৈরী করে এবং মাটির নীচে পোঁতা যন্ত্রপাতি উদ্ধার করে। ও এখন শ্রমবীর।" আমরা ওয়াং ওয়ান খু-র বাড়ীতে গেলাম। সে ও তার স্ত্রী আমাদের যত্ন করে বসাল। তাদের জীবনের কাহিনী শুনলাম। চীনের হাজার হাজার মজুরের মত এরাও কোনদিন পেটভরে খেতে পায়নি। দারিদ্র্য এদের ঘরে এমন ভাবে বাসা বেঁধেছিল যে সারা বছর ভূষির রুটি আর রাঙা আলু সেদ্ধ খেতে হত। বাচ্ছাগুলোকে বাধ্য হয়ে ভিক্ষে করতে পাঠাত। এখন তারা দেখলাম সুন্দর দুটি ঘর-ওয়ালা আধুনিক ধরণের ফ্ল্যাটে থাকে। হেসে দেখাল নতুন জামা কাপড় কিনেছে। বাচ্ছারা ইস্কুল যাচ্ছে। "এমন কি মুরগীও খাই আমরা আজকাল—প্রায়ই। ভূষির রুটির দিন শেষ হয়েছে।"—ওয়াং তার বড় ছেলেটার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল।—দেখলাম সারি সারি সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ী। ইস্পাতের সৃষ্টিকর্তা যন্ত্ররাজ মজুর শ্রেণীর উপযুক্ত বাসস্থান এগুলো। দূরে দেখলাম আরও নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। সমস্ত এলাকাটার দিকে তাকালে মনে হয় সে যেন বলছে "গড়ো, গড়ো, গড়ো।"

অনেক উঁচুতে, প্রায় আকাশের গা ছুঁয়ে—দেখলাম একটা লাল ঝাণ্ডা হাওয়ায় নাচছে। যে ফার্নেসের ওপর ঝাণ্ডা উড়ছে সে ফার্নেসের মজুররা উৎপাদন বাড়ানোর অভিযানে সব চেয়ে অগ্রণী। তাই তাদের সম্মান জানাচ্ছে ঐ লাল ঝাণ্ডা। চীনের সুখী জীবন গড়ার অভিযানে আনন্দ জানাচ্ছে—মানুষকে, আকাশকে, দুনিয়াকে।

যেদিন শুনলাম মার্কিনরা কোরিয়ার যুদ্ধকে চীনে বিস্তার করার জন্যে আনসানের ওদিকে বোমা ফেলেছে—সেদিন মন বিদ্রোহে অস্থির হয়েছিল। মনে পড়েছিল ঐ লাল ঝাণ্ডাকে। মনে পড়েছিল কি শান্তি আর বিশ্বাসের ছবি আমাদের সামনে মেলে ধরেছিল আনসানের মজুররা। আর মনে হয়েছিল কি

অসম্ভব এই শক্তিকে হারানো। ইস্পাতের মত সাচ্চা জঙ্গী মন চীনের মজুরদের। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কত হত্যা করবে? হাজার, লক্ষ, কোটি চীনের মানুষকে? তবু তারা জিততে পারবে না। মুক্ত মানুষের শক্তিকে আণবিক বোমা দিয়ে টলানো যাবে না। আনসানের ইস্পাত সৃষ্টি করে যে মজুর, সে সৃষ্টি করে চলবে। আর বাতাসে নীল আকাশের গায়ে লাল ঝাণ্ডা উড়বে—ধ্বংসের মধ্যে থেকে উঠবে নতুন বাড়ী।—ওয়াং-এর মত মানুষ অমর! লাল ঝাণ্ডা অমর! মুক্তি অমর!

নওজোয়ান

সেদিন নভেম্বরের এক দিন-আলো-করা রবিবারের সকাল। "নিষিদ্ধ নগর"-এর চওড়া ফটক পার হয়ে যে বড় রাস্তা বাজারের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সে রাস্তা ধরে যেতে যেতে চীনের যুবশক্তির সঙ্গে দেখা। হাতে কোদাল, গাঁইতি, সাবল, হাতুড়ি নিয়ে ওরা "পুরনো পথগুলোকে সুন্দর নতুন পথ"-এ পরিণত করতে চলেছে। ওরা হাসছে, গাইছে আর নিজেদের ফুর্তিকে আশেপাশের লোকজনের মধ্যে সংক্রামিত করছে। পথের চারিদিকে সব পথচারীরাই থেমে থেমে দেখছে আর অল্প অল্প হাসছে। খানিক দেখে দেখে আমাদেরও মুখগুলো হাসি হাসি হয়ে উঠল।

একটা প্রকাণ্ড 'লাউড্‌স্পিকার' অবিরাম কি সব বলে চলেছে ভীড়ের মধ্যে। অনেক ধরনের চেঁচামিচির মধ্যে থেকে কানে এল কে একজন বলছে—"পথে যাঁরা বিনা কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আসুন, এগিয়ে আসুন। আমাদের ব্রিগেডে যোগ দিন। দেশ আপনার, আমার, সকলের। তাকে গড়বো আপনি, আমি, সকলে।" অনেকে গান করছিল। অদ্ভুত পাগল করা সুর। সুরটা শুনলে মনে হয় সঙ্গে বুঝি ঢোল বাজছে। কিন্তু আসলে এমন তালে তালে পড়ে যে, অনেকটা ঢোলে কাঠি পড়ার মত শোনায়। ওরা খালি গলায় গাইছে—ডিং ডিং ডা ডা, ডিং ডিং ডায় ডা ডা ধরনের তালে।

হাতে হাত দেয়
মুঠি দিয়ে মুঠি বাঁধে
কচি কচি ডাল
লাখে লাখে দেয় মেলে—
এক সাথে হাঁকে,

বজ্রকে হার মানায়।
লাখে লাখে তারা
হাঁকে একসাথে—ভাইরে।

রবিবার। আমাদের দেশে এ সময় ক্লান্ত যুবকরা দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে সিনেমার লাইনে দাঁড়াবার তাল খুঁজছে। কেউ বা রবিবারটা বটতলার একখানা উপন্যাস পড়ে নিজের লেখাপড়া শেখার মর্যাদা রাখছে। প্রগতিশীল যুবকেরা খুব জোর সভাসমিতি করে পুলিশের লাঠির স্বাদ পাচ্ছে। ঔপনিবেশিক বা ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর যুবকদের প্রায় সর্বত্রই এই একই দশা। গণতান্ত্রিক দেশগুলোর যুবকদের রবিবার নানা বিচিত্র কাজে কাটে। চীনের দেশ গড়ার সমস্যা সবচেয়ে প্রবল। তাই এখানকার যুবসমাজ রবিবারের আনন্দ পায় ব্রিগেডে কাজ করে; এ কাজ তাদের কাছে আনন্দের। ওরা বলে, "আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ হল সাম্রাজ্যবাদীদের আঁস্তাকুড় এদেশ থেকে চিরদিনের মত সাফ করে ফেলা— আ-হা কি আনন্দ—" বলে ওরা এমন একটা গান ধরে দেয়। প্রাণমাতানো স্বর শুনে আমার চোখে জল আসে। মনে পড়ে আমার সেই কলকাতা শহরের ছোট্ট "শু-শাইন"দের কথা। শৈশবই নেই আমাদের—এমন যৌবন পাব কোথায়? চারদিকে এত আনন্দ, এত আলো আর হাসি সত্ত্বেও আমার মন ব্যথায় ভরে উঠল। আমার দেশে যে যৌবন নেই, সে কথা এমন করে কোনদিনই মনে পড়েনি।

"অভিনন্দন, সেলাম"—একজন অল্পবয়সী ছেলে দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথাগুলো বলতে লাগল, "আমাদের দেশে স্বাগতম্।"

"কোথায় চলেছ?" আমরা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর এল, "পিকিংকে দুনিয়ার সেরা শহর বানাতে।"

শুনলাম এদের মধ্যে একজন মজুর কর্মবীর আছে। মজুরটি অন্যান্যদিন কারখানার সহকর্মীদের কাছে উৎসাহ জোগায়, নিজে খাটে। রবিবার যুব-ব্রিগেডের সংগঠক হিসেবে যুব-সমাজকে জাগায়। এই সব ছেলেমেয়েরাই আজ নতুন চীনকে সোনার ভবিষ্যতে টেনে নিয়ে চলেছে।

পিকিং উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে চীনের গণতান্ত্রিক যুব সংঘের স্কুল কমিটির সম্পাদিকা লো-লিং-এর সঙ্গে দেখা হল। মেয়েটি আগে গেরিলা বাহিনীতে লড়ত। বিপ্লব জয়যুক্ত হল ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। যুব সংগঠনের উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে লো-লিং বলল, "বিপ্লবের আগে কুয়োমিণ্টাং-শাসনের যুগে আমাদের যুব আন্দোলনের মূল দাবী ছিল—ভাঙো—পুরনো সমাজের মূলে আঘাত করো। এখন আন্দোলনের ধারা ঠিক উল্টো। এখন আমাদের মূল আওয়াজ হল—গড়ো, গড়ো, সাধারণের জন্যে জীবন সুন্দর করে তোলো।

"ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক চেতনা জাগাবার জন্যে আমরা পাঠচক্রের ব্যবস্থা করি। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের মাথা থেকে পুরনো চিন্তা আর ধারনা তাড়ানো মোটেই শক্ত নয়;কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের মাথায় পুরনো দিনগুলো এমন গেঁথে বসে গেছে যে সহজে নড়বার নয়। সেজন্যে আমাদের ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের চিন্তাধারা বদলাবার অনেকটা দায়িত্ব আমরাই নিয়েছি। আমরা শিক্ষয়িত্রী আর ছাত্রীদের মিলিত পাঠচক্র করি। সেখানে আমাদের ইস্কুলে পড়াবার কায়দা, শিক্ষা-প্রণালীর বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হয়। এসব সভায় এমনকি আমরা আমাদের সাপ্তাহিক পড়ার হিসেব নিকেশ করি। এসব এই জন্যেই বিশেষ করে করতে হয় কারণ এখনও আমাদের পাঠ্যতালিকার পুরোপুরি বদল হয়নি। শুধু ইতিহাস প্রভৃতি মূল বইগুলোর বদল হয়েছে।

"আমরা মাতৃভাষায় সমস্ত জিনিষ পড়ি। আর এই প্রথম আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে শ্রম এবং শ্রমিককে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আমরা ইস্কুলে নিজের দেশের আর অন্যান্য দেশের মানুষকে ভালবাসতে শিখি।" তারপর ইস্কুলের ঘণ্টার পর কি ধরনের কাজকর্ম ছাত্রীরা ভালবাসে, তা বলতে গিয়ে ও অস্থির হয়ে উঠল।

"আমাদের বাচ্চাগুলোকে এখনও চেনোনি বোধ হয়। উৎসাহ দেখে হতভম্ব হতে হয়। সেদিন কেন্দ্রীয় সংঘ থেকে জানতে চাইল আমাদের ইস্কুল থেকে ব্রিগেডের কাজে কেউ যেতে চায় কিনা। কথাটা শুনেছে কি শোনেনি, ইস্কুলের এক হাজার ছাত্রী নাম দিয়ে দিল। কিন্তু অতজন দরকার ছিল না! তাই কি করি?

ছোটদের বাদ দিলাম। বাচ্ছারা কান্না জুড়ে দিল। বলল, বড় বলে নাকি আমরা ওদের ওপর অন্যায় সুবিধে নিচ্ছি।”

বিপ্লবের আগে চীনের শিক্ষার অবস্থা আমাদের মতই ছিল। চাষী-মজুরদের ছেলেমেয়েরা হাজারে একটাও লেখাপড়া করতে পেত না। এখন স্কুলে যাতে বেশী সংখ্যায় মজুর-চাষীদের ছেলেমেয়ে নেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাজার হাজার স্পেশাল ক্লাস খোলা হয়েছে যার ভেতর দিয়ে পশ্চাদপদ ছাত্ররা এগিয়ে সাধারণ ইস্কুলে ভর্তি হতে পারে। পিকিঙের স্কুলগুলোতে ২৬,০০০ মজুরের ছেলেমেয়েদের বিশেষ “স্কলারশিপ” দেওয়া হয়। এক বছরে প্রাথমিক ও মধ্য স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে ১ কোটি ৬০ লক্ষ হয়। মাঞ্চুকুয়ো “সাক্ষীগোপালে”র শাসনের সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে স্কুলের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছ'হাজার গুণ বেড়েছে। উত্তর চীনে এই অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের সংখ্যা কুয়োমিণ্টাং শাসনের সময়ের চেয়ে শতকরা দেড়গুণেরও বেশী বেড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ মিলল। তারা বার বার বলল: যদি আমরা তৃতীয় মহাযুদ্ধ আটকাতে পারি তাহলে চীন প্রতি বছর সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়েস একান্ন বছর। দু হাজার ছাত্রছাত্রী এখানে পড়ে। এদের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি-মণ্ডলীর সভ্য ওয়াং সুয়ে-চুনের কাছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শুনলাম। দেওয়ালে লেখা “নতুন গণতন্ত্রের জন্যে আমরা পড়বো” আওয়াজটি দেখিয়ে ওয়াং সুয়ে-চুন বলল যে আগে এ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পাথর উত্তেজনায় কাঁপত। এর প্রতিটি ইঁটের সঙ্গে যুব সংগ্রামের ইতিহাস জড়ানো আছে। আজ এরা একাগ্রমনা ছাত্রে পরিণত হয়েছে। দেখে চেনাই যায় না। ওয়াং সুয়ে-চুনকে দেখলে মনেই হয় না সে কোনদিন পুলিশের সঙ্গে সমানে লাঠি নিয়ে লড়েছে। যখন পুলিশ গুলি করে ছাত্র নেতাদের খুন করত, তখন বজ্রকণ্ঠে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আওয়াজ ওঠাত, “একজন পড়লে দশজন তার জায়গা নেবে”, “মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ চীন ছাড়ো,” “গৃহবিবাদ আর অনাহার মুর্দাবাদ” ইত্যাদি।

চিং-হুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাদের বিরাট অভ্যর্থনা সভায় নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠাল। গেট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা অবধি লাইন করে দাঁড়িয়ে এরা নানান আওয়াজ তুলছে, তাদের হাততালিতে আকাশ কেঁপে উঠছে। অনেকে অটোগ্রাফের জন্যে ছুটে আসছে। কেউ বা রিবনের লাল গোলাপফুল অথবা ব্রোচ পরিয়ে দিচ্ছে। ওদের এই দরাজ ব্যবহারে সকলের মনেই সাড়া জেগেছে। এমন মিষ্টি ব্যবহার ওদের—ভাল না বেসে পারা যায় না।

আমার শরীরটা ভাল না থাকায় ঠিক হয়েছিল অভ্যর্থনা সভায় আমি বলব না। কিন্তু হলে পৌছে শুনলাম ছাত্ররা আগের থেকে জানিয়ে রেখেছে যে ভারতবর্ষকে বলতেই হবে। কিছুতেই নিস্তার নেই দেখে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখনও মুখ খুলিনি কিন্তু হাততালি আর চীৎকারে হলের ছাদ উড়ে যাবার মত হল। বুঝলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দরদটা এদের কিছু বেশী। আমি ওদের কাছে বলতে লাগলাম কি ভাবে কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি জায়গায় আমাদের ছাত্ররা বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছে, পুলিশের লাঠিবাজিকে ভয় পায়নি, কি ভাবে অসীম সাহসের সঙ্গে আমাদের যুবসমাজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে। প্রতিটি ঘটনার উল্লেখ করতে না করতে হল ফাটিয়ে আনন্দধ্বনি উঠছে। নীল টুপি, ছাতা, বই—সব ওরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। এত ভীড়, আমার ভয় হচ্ছিল কেউ কেউ লাফালাফিতে না ওপরের বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায়। একজন বলছে, "ইন্দো-চীন বন্ধুত্বকে"—সকলে বলছে "হুরা—" "ভারতীয় ছাত্রদের—হুরা" "চীন বিপ্লবকে—হুরা।"

হোটেলের কাছে পৌচেছি। দেখি দূর থেকে সাইকেল চালিয়ে আসছে একটি মেয়ে। উত্তেজিত হয়ে আমাদের ডাকছে। মনে পড়ল একে আগে দেখেছি—ওদের ইস্কুলে গিয়েছিলাম। বছর বারো বয়েস, ইস্কুলের কিশোর-বাহিনীর সংগঠক। লাল গাল দুটো উত্তেজনায় আপেলের মত চক চক করছে। তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে বলল, "উঃ, আমি ভেবেছিলাম তুমি চলে গেছ। কি সাংঘাতিক হত তা হলে!" বলে পকেট থেকে একটা কাগজ সযত্নে টেনে বার করল। বলল, "এটা আমাদের অভিনন্দন। ভারতীয় ছাত্রদের দিও। আমরা সকলে মিলে

লিখেছি।” তারপর খুব বাচ্ছা মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “উঃ, তোমার জন্যে আমরা কি ভাবে অপেক্ষা করেছি। সেবার এলে না তুমি। আমাদের নিজে হাতে তৈরী করা পুতুল, খেলনা সব দিয়ে দিলাম ছোট বাচ্ছাদের। কেন, কেন এলে না সেবার ?” আমি ঘটনাটা ঠিক ঠাওর করতে না পেরে দোভাষীকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বলল, আমাদের পৌছনর ঠিক পর থেকেই চীনের বিভিন্ন স্কুল থেকে দাবী আসে যেন আমরা তাদের দেখতে যাই। বিশেষ করে পিকিং-এ এ দাবী চীনা মহিলা সংগঠকদের প্রায় পাগল করে ছেড়েছিল। এদের স্কুলে আমার যেদিন যাবার কথা ছিল সেদিন আমরা সাংহাই অভিমুখে রওনা দিয়েছিলাম। ওরা অনেকে নাকি কেঁদে ছিল। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিকে দেখতে না পাবার দুঃখ সে দিন তাদের অভিভূত করেছিল।

আমি ওর দুগালে চুমো খেয়ে বললাম, “আমি জানতাম না। জানলে কখনও তোমাদের দুখ্যু দিই—!”

দেখলাম সযত্নে চীনা ভাষায় তুলি দিয়ে লিখেছে—

“ভাই ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা! আমরা নতুন চীনে আজ মহা আনন্দে লেখাপড়া শিখছি। কিন্তু আমরা তোমাদের জন্যে বিশেষ চিন্তিত। ভাবছি তোমাদের কথা, যারা বীরত্বের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছ। পৃথিবীতে ভারতবর্ষ আর চীনের প্রকাণ্ড গৌরবময় ইতিহাস। এস আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এক হয়ে বৃটিশ আর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ি।

“আক্রমণকারী বর্গী, যাদের পাণ্ডা হল মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ তারা নিপাত যাক !

“এসো দুনিয়ার সবচেয়ে সম্মানজনক কাজ আমরা এক সঙ্গে করি—ভারতবর্ষ ও দুনিয়ার মানুষের মুক্তির জন্যে শেষ অবধি লড়ি !”

বুদ্ধিজীবী

শ্রীযুক্তা লী পা-চাও চীনের বিখ্যাত লেখিকা। চীন বিপ্লবের শুরু থেকেই ইনি আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। বিখ্যাত লং মার্চের ৩০ জন মেয়ের ইনি ছিলেন একজন। চীনের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ইনি এক বিশেষ জায়গা জুড়ে আছেন। লেখক এবং সংগঠক হিসেবে তাঁকে চেনে না চীনে এমন লোক আজ কম।

চীনের বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষ করে চীনের নতুন সাহিত্যের সমস্যা আলোচনা কববার জন্যে লী পা-চাওকে ধ'রে পড়লাম। হাতে পর্বত প্রমাণ কাজ; তবু রাজি হলেন। যখন ওঁর কাছে পৌঁছলাম, শুনলাম উনি আমায় অনেক আগেই আশা কবেছিলেন। দোভাষীর ভুলে আমার দেরী হওয়ায় ওঁকে মুশ্‌কিলে পড়তে হল। বললেন যে, আগে থেকে ঠিক আছে এক যাত্রার রিহার্সালে যাওয়ার। সে রিহার্সালের সমালোচনা হলে তবে তা রঙ্গমঞ্চে নামানো সম্ভব হবে। সেখানে ওঁর উপস্থিত অপরিহার্য। ইতস্তত করে লী পা-চাও বললেন, "যাবেন? যাত্রার ভবিষ্যৎ সমন্ধে আমরা আলোচনা করব। নিজে চোখে দেখবেনও।"

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি। বাইরে ঝিরঝির করে বরফ পড়ছে। চারিদিক সাদা হয়ে আছে। আকাশ দেখা যায় না। মনে হয় সমস্ত দুনিয়াটা বুঝি কেবল নরম ছেঁড়া উড়ন্ত তুলোর মত বরফে ভরে আছে। হাঁটলে পা ডুবে যায়। মচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়। রাস্তার আলোগুলো ম্লান হয়ে চেয়ে আছে। বরফের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন তারা হয়রান হয়ে পড়েছে।

এ-হেন আবহাওয়ায় কিন্তু রাস্তায় লোকের অভাব নেই। কান-ঢাকা লোমের টুপী পরে জবুস্থবু বুড়োবুড়ী থেকে জোয়ান, বাচ্ছা, মেয়ে সব বরফ মাড়িয়ে সোজা একদিকে চলেছে। কেউ কেউ নীল কোর্তার আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে মাথা নীচু

করে চলেছে। যাদের চশমা চোখে, তারা এক হাতে চশমা ঢেকে চলবার চেষ্টা করছে। যাদের দস্তানা আছে তারা আরেকটু স্বাভাবিক ভাবে হাঁটছে। শুনলাম এরা যাত্রা দেখতে চলেছে। সারাদিন কাজকর্মের মধ্যে কাটে। সন্ধ্যেবেলা শহরে ভাল যাত্রা থাকলে হাজার বরফ পড়া তাদের আটকাতে পারে না। যাত্রাকে নতুনভাবে চালু করায় এর জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে।

কয়েকদিন আগে একটি যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম। ঘরে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। এমন পুরনো ভাষায় যাত্রা হচ্ছিল যে আমার দোভাষী নিজেই বেশীর ভাগ বুঝতে পারেনি, জিজ্ঞেস করলাম তবে লোকে ছাখে কি করতে। দোভাষী জানাল, "যাত্রা আমাদের বহু পুরনো এবং প্রায় একমাত্র জিনিষ যার দ্বারা পুরনো চীনের জন-সাধারণ তাদের বৈচিত্র্যহীন জীবন থেকে খানিকক্ষণের জন্যে মুক্তি পেত। এতে যে সব গল্প দেখানো হয় তা বেশীরভাগ আমাদের পৌরাণিক যুগ নিয়ে লেখা। যাত্রার ভাষা অতি পুরনো যুগের। কিন্তু তবু লোকে যাত্রা ভালবাসে কারণ তার চলা বলা, গান বাজনা—এক কথায় 'ফর্ম'টিতে তারা অভ্যস্ত। তাছাড়া পৌরাণিক গল্পগুলো যুগ যুগ ধরে আমাদের গণচেতনার সঙ্গে জড়িত। তাই যাত্রার ফর্মকে নতুন ভাষা ও গল্পের ছাচে ফেলবার জন্যে গবেষণা চলেছে।"

এদের যাত্রার সঙ্গে আমাদের যাত্রার প্রথম তফাৎ হল এরা বন্ধ ঘরে যাত্রা করে। মঞ্চের ওপর নায়ক বা রাক্ষস বা রাজাকে চিনতে হবে তার মুখে আঁকা মুখোস দেখে। সাধারণত ছেলেরা মেয়ে সাজে। তাদেরও সাজ দেখে বুঝতে হবে তারা ভাল মেয়ে না খারাপ মেয়ে! এদের যে বাজনা তা অত্যন্ত আদিম। কাঁসর ঘণ্টা আর দু তার বা তিন তারের এসরাজ বাজিয়ে কন্‌সার্ট সুরু হয়। শুনতে অনেকটা আমাদের পূজোর মণ্ডপে আরতির মত। এই বাজনার সঙ্গে অদ্ভুত উঁচু স্কেলে গান শুরু হয়। বহুদিন ধরে কানকে পরিচিত না করাতে পারলে সে গান ভাল লাগা অসম্ভব। চীনে নাচ, আমরা যাকে নাচ বলতে অভ্যস্ত, নেই বললেই হয়। যাত্রায় যে নাচ হয় তা প্রধানত অঙ্গভঙ্গী। পায়ের কাজ খুব সামান্য। এ ছাড়া আছে ওড়না দুলিয়ে চমৎকার এক ধরণের নাচ। অবশ্য এগুলোকে নাচের চেয়ে কসরৎ বলাই ঠিক হবে। এদের 'ইয়াঙ্কো' হল একমাত্র জনপ্রিয় নাচ, যার সরল পায়ের

কাজ সকলেই অনায়াসে শিখতে পারে। চীনের নতুন সংস্কৃতি গড়ার কাজে ইয়াঙ্কো নাচ বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়েছে। ওদের ইয়াঙ্কো তালের ভিত্তিতে যে ড্রাম-নাচ, তা দেখে গা শির-শির করে ওঠে। নতুন চীনের সমস্ত আবেগ, সমস্ত চেতনা, যেন এই ড্রাম-নাচের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ নাচ আমরা বহুবার দেখেছি। তবু আর একবার দেখবার ইচ্ছে কখনও কমেনি।

রিহার্সালের হলে পৌঁছলাম। সেখানে জমা হয়েছেন পিকিং-এর নামকরা শিল্পী, গায়ক, সাহিত্যিক অভিনেতা ইত্যাদি। রিহার্সাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লী পা-চাওয়ের জন্যে আবার নতুন করে আরম্ভ করা হল। বোঝা গেল এ ব্যাপারে ওঁর মতামতকে এঁরা বিশেষ মূল্য দেন।

পৌরাণিক যুগের গল্পকে এঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুন ছাঁচে ঢেলেছেন। পুরনো কথোপকথনকে বোঝার উপযুক্ত চলতি ভাষার কাছাকাছি আনা হয়েছে। যে সব গল্প বাছা হয় স্বভাবতই তাব একটা প্রগতিশীল বক্তব্য থাকে। আমরা যে বইটির রিহার্সাল দেখতে এলাম তার গল্প অতি সাধারণ। কেমন করে সে যুগের এক ছাত্র তার সাধনা সফল করতে গিয়ে দুষ্টু লোকের হাতে পড়ে নাকানী চোপানী খায়। রাজা ইত্যাদির অন্যায় অত্যাচারে সে যখন পাগলা ক্ষ্যাপা হয়ে যায় তখন একদিন রাজা খবর পায় এই সেই ছাত্র যাকে উপাধি দেবার জন্যে সে নিমন্ত্রণ করেছিল। আগে ছেলেরা নায়িকার ভূমিকায় নামত, এখন মেয়েরা নামে।

রিহার্সাল শেষ হলে বইয়ের দোষ ত্রুটি নিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা চলল, যা বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেন না আলোচনার বিষয় ছিল এতই টেক্‌নিকাল যে, সে বিষয়ে যারা ভালভাবে না জানে তাদের পক্ষে কিছু বোঝা সম্ভবই নয়।

লী পা-চাও এবার মন দিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "তোমাদের এবং আমাদের দেশের সাহিত্যের যে মৌলিক সমস্যা তা একই জাতের। আমাদের মত আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীদের সংগ্রামে অংশগ্রহণ অপরিহার্য এবং অতি আবশ্যকীয়। চীনের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে সাংস্কৃতিক কর্মীদের দানের কথা সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

পিকিং-এর কথা বলতে বলতে লী পা-চাও উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন। যেমন কলকাতা বলতে বাঙালী লেখকরা দিশেহারা হন।

"আমাদের মুক্তি-সংগ্রামে পিকিং বরাবরই এগিয়ে ছিল। বিখ্যাত ৪ঠা মের আন্দোলন পিকিং থেকে শুরু হয়ে সারা চীনে ছড়িয়ে পড়ে ; সে আন্দোলন বিশেষ করে সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পিকিং শুধু আজ নয়, যুগ যুগ ধরে আমাদের অতি প্রিয় শহর। চীনের সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রস্থল ছিল পিকিং—আজও আছে। তাই স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই-এর সাড়া পিকিং-এ জাগে সকলের আগে।" লী পা-চাও তন্ময় হয়ে গেলেন পিকিং-এর জয়গানে। বুঝলাম যে শহরে আছি তার ঘরে ঘরে কী গভীর ভালবাসা বাসা বেঁধে আছে। আমিও মনে মনে কল্পনা করতে লাগলাম আমাদের বিপ্লব হলে বুদ্ধিজীবীরা কলকাতা সম্বন্ধে এমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতেন বিদেশী পাঠকদের কাছে। লী পা-চাও বলে চললেন,

"১৯২৫ সালে সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ল দা-চাওকে ফাঁসি দিল। দেশে দারুণ বিক্ষোভ জেগে উঠল। বুদ্ধিজীবীরা বই ফেলে দলে দলে আন্দোলন গড়ে তুলবার কাজে এগিয়ে এলেন। তারপর কত ধরপাকড়, গুলি, ফাঁসি, চলল কিন্তু পিকিং-এর বুদ্ধিজীবীদের আর সক্রিয় রাজনীতির পথ থেকে ফেরানো গেল না। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এই মুক্ত চেতনাকে ঠিক পথে চালাতে এগিয়ে এল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। তারই নেতৃত্বে আজ আমরা স্বাধীন বুদ্ধিজীবী হবার গর্ব অর্জন করেছি।

"৯ই ডিসেম্বরের আন্দোলনও পিকিং-এ শুরু হয়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই কে এক নতুন ধাপে এনে ফেলেছিল এই আন্দোলন। তখন দেশে দারুণ হতাশা। জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার অঙ্গীকার নিলেও কুয়োমিণ্টাং কাজে কিছুই করছিল না। দেশকে হতাশা থেকে টেনে তুলল ৯ই ডিসেম্বরের ডাক। "দুর্ভিক্ষ-বিরোধী" "দমননীতি-বিরোধী" আন্দোলন গড়ে তুলে পিকিং-এর বুদ্ধিজীবীরা মুক্তি-ফৌজকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকে। শুধু বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন কেন, চীনের মজুর আন্দোলনও শুরু হয় এই পিকিং-এ—চাং চিন-তিয়েন নামে পিকিং-এর

পাশেই এক গাঁয়ে এক ছোট্ট মফঃস্বল শহরে রেল শ্রমিকদের মধ্যে থেকে। এই সব মজুর আন্দোলন ও পার্টির সংস্পর্শে থাকার দরুণ পিকিং-এর বুদ্ধিজীবীরা পিকিং-এর ঐতিহ্যকে সাচ্চা পথে রাখতে পেরেছিল।

"তবে এই সাচ্চা পথ তৈরীর কাজ একদিনে হয়নি। বুদ্ধিজীবীদের মনও একদিনে বদলানো সম্ভব হয়নি। কঠিন লড়াই করতে হয়েছিল। রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের মাথা থেকে ভুয়ো মার্কস্‌বাদী ধারণাগুলো তাড়ানোর জন্যে তাদের প্রথমে মুক্ত এলাকায় পাঠানো হত। তাদের শহুরে কল্পনাবিলাসী মনের উড়ো "জনসাধারণের" ভূত তাড়াবার জন্যে তাদের গ্রামের চাষীদের মধ্যে ফেলে দেওয়া হত। তাদের নানা ধরণের দৈনন্দিন কাজ দেওয়া হত। কেউ কেউ মুক্তি ফৌজের সৈন্য হয়ে যেত! হাতে কলমে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের জীবন সম্বন্ধে শিখত। শহুরে ধোঁকাবাজি থেকে মুক্তি পাবার এ এক ধন্বন্তরী অষুধ।

"মুক্ত এলাকায় এসে বুদ্ধিজীবীরা দারুণ সমস্যার সামনে পড়েন। তাঁরা দেখেন, কুয়োমিণ্টাং এলাকায় যা ছিল প্রগতিশীল, মুক্ত এলাকায় তার কোন মূল্যই হয়ত নেই। এখানে সমস্ত জিনিসের মূল্য যাচাই করার ধরণই আলাদা। কুয়োমিণ্টাং এলাকায় সাহিত্যিকদের মূল দাবী ছিল—ভাঙো। অথচ মুক্ত এলাকায় মূল দাবী হল—গড়ো ; মুক্ত এলাকার জনসাধারণ প্রতিদিন নতুন বিষয়বস্তু ও নতুন আঙ্গিক দাবী করতে লাগল। চাষী, মজুর আর সৈন্যদের দাবী সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন বদলাতে লাগল। বুদ্ধিজীবীরা নতুন পথ খুঁজতে নাজেহাল হয়ে পড়লেন। সমস্যার সমাধানের জন্যে ১৯৪২ সালে ইয়েনানে এক সভায় বুদ্ধিজীবীরা জড়ো হলে, মাও সে-তুং পরিস্কার ভাবে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু কী হবে তা বুঝিয়ে দিলেন। সেই থেকে নতুন বল পেয়ে চীনের বুদ্ধিজীবীরা সত্যি সত্যি জনসাধারণের মত ক'রে সাহিত্য, গান, বাজনা, নাটক সৃষ্টি করতে লাগলেন।

"আজ নতুন চীনের বুদ্ধিজীবীদের সর্বপ্রথম কাজ হল, 'মাও সে-তুং চিন্তা'কে আয়ত্ত করা। 'মাও সে-তুং-চিন্তা' মানে চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। সমাজের

বিপ্লবী বদলকে বুঝতে হলে যে মার্কসীয় "ক্লাসিক্‌স" পড়া অপরিহার্য তা আমরা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করি। বাস্তব ক্ষেত্র থেকে শিখবার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসবান হওয়ায় আজ আমাদের সাহিত্যিকেরা জনতা থেকে দূরে বসে লেখার ধারণা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন।

"অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি বুদ্ধিজীবীদের চেতনাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজাব কাজ খুব সাংঘাতিক কঠিন কিছু নয়। জীবনের প্রতি তাদের এক স্বাভাবিক সুস্থ মনোভাব থাকায় তারা অবস্থার গতিকে সহজে বুঝতে শেখে। সাধারণভাবে দেখেছি যৌথভাবে জীবন গড়ে তোলার কাজে তারা বাধা সৃষ্টি করেই না, বরং সহজে যোগ দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ হয়েছে বৈকি।

"বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কে বদল আনা যত সহজ তাদের, অভ্যাস বদলে আনা তত সহজ নয়। বিশেষ করে চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে তারা নাজেহাল হয়ে পড়ে। এর কারণ বোঝা অবশ্য খুবই সোজা। প্রথমত, বুদ্ধিজীবীরা প্রায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আসে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। তাই তারা ঘাবড়ে গিয়ে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে আসতে ভয় পায়। কিন্তু প্রশংসার বিষয়, আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মাও-এর 'সমস্ত প্রাণ দিয়ে জনসেবা কর' এই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাধা পেরোতে পেরেছে।' তারা এখন সত্যি সত্যি মার্ক্‌স্‌বাদী বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠছে।

"বুদ্ধিজীবীদের শিক্ষা অর্থাৎ, তাদের মন থেকে ব্যক্তিত্ববাদের ভূত ছাড়াতে আমরা দুটি উপায় অবলম্বন করেছিলাম: (১) সৈন্য হিসাবে ফৌজে পাঠানো। সৈন্য জীবনের কঠিন কেন্দ্রীয় নিয়মানুবর্তিতা ও রাজনৈতিক শিক্ষা, ব্যক্তিত্ববাদকে গুঁড়িয়ে দেয়। (২) গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া। একেবারে সরাসরি গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেমে চাষী ও মজুরদের মধ্যে থাকা। এতে বই-পড়া বিদ্যের দৌড় ও সংগঠনের শক্তি সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন জনগণের মধ্যে থেকে অনুপ্রেরণা পাবার ইচ্ছে সত্যিকারের একটা বাস্তব ইচ্ছেতে পরিণত হয়।

"যখন দেশ জুড়ে ভূমি-সংস্কারের কাজ শুরু হল, তখন বুদ্ধিজীবীরা তাদের

দায়িত্বের অংশটুকু পুরোপুরি পালন করেছে। তারা ভূমি-সংস্কারকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবার সমস্ত আয়োজনকে তাদের দিক থেকে যত রকমে পারে সমর্থন করেছে।

"চীনের যেসব সাহিত্যিক জনগণের লেখক বলে নাম করেছেন, তার মধ্যে চাওস্থ-লী হলেন অন্যতম। ইনি আগে চাষী ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবন সুরু হয় বিপ্লবের শেষের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইনি পাননি। আন্দোলনে আসার ঠিক আগে এক ছাপাখানায় প্রুফ পড়ার কাজ করছিলেন। তাঁর প্রথম বই যখন বার হল, কেউই সন্ধান নিল না তাঁর। শেষে ১৯৪২ সালে মাও সে-তুং-এর ইয়েনান বক্তৃতার পর এ বই আবিষ্কৃত হল। চাও সু-লী আধুনিক কায়দায় লেখেন, জনগণের মুখে তাদের ভাষা দেন। তাই তাঁর বই সাধারণের কাছে সমাদৃত। মাও-এর এই বক্তৃতা সত্যিই এক নতুন এবং মূল্যবান সাহিত্যিককে আবিষ্কার করেছে!

"চীনের আর এক আধুনিক সাহিত্যিকের প্রতিভার কথা আজ সারা দেশজুড়ে। এঁর "পক্ককেশী মেয়ে" খুবই জনপ্রিয় বই। ইনিই প্রথম যৌথভাবে নিজের লেখা আলোচনা করে উন্নত করবার উপায় চালু করেন। এঁর লিখবার পদ্ধতি ছিল চমৎকার। প্রথমে ইনি একটি গল্প লিখতেন এবং লেখা হলে একদল উৎসাহী লোকের সঙ্গে আলোচনা করে দোষত্রুটি সংশোধন করে নিতেন। পরে এ পদ্ধতিকে বদলে আরও উন্নত করা হয়। নতুন নিয়মানুসারে লেখক মনে মনে একটি গল্পের কাঠামো তৈরী করেন। প্রথমে লেখক যান সেইসব চরিত্রের কাছে, যাদের তিনি তাঁর বইতে দেখাতে চান। তারা নানা আলোচনার ভেতর দিয়ে লেখকের কাছে নিজেদের পরিচয় দেয়—তাদের আশা, ভরসা, অভিজ্ঞতা, ভালবাসা সমস্ত বিষয়ই আলোচনা চলে। এই ধরনের আলাপের পর লেখক তাঁর বই লেখা শুরু করেন।

"তিংলিং হলেন চীনের বিখ্যাত লেখিকা। ইনি লেখার রসদ সোজাসুজি মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে থেকে সংগ্রহ করেছেন। ১৯৩৬ সালে ইনি লাল ফৌজে যোগ দেন। 'সাংগাং নদীর ওপর' বইখানিতে তিনি ভূমি-সংস্কার নিয়ে লিখেছেন।

লেখা পড়লেই বোঝা যায়, লেখিকা নিজে ভূমি-সংস্কারে অংশ নেওয়ায় চাষী চরিত্রকে অস্থি-মজ্জায় চিনেছেন।

"কুয়ো মো-জোর লেখার ধরন ওপরে যাদের নাম করলাম তাদের চেয়ে অনেক তফাৎ। যদিও উনি 'মাও সে-তুং-চিন্তাধারা'য় বিশ্বাসী, তবু মুক্ত এলাকায় না থাকায় তাঁর লেখার ধরন অন্যরকম করতে হয়েছিল। মুক্ত এলাকায় লেখকেরা লিখতেন চাষী, মজুর আর সৈন্যদের বোঝার উপযুক্ত করে। কিন্তু কুয়োমিণ্টাং এলাকায় প্রগতিশীল লেখকরা প্রধানত মধ্যবিত্তের বোঝার উপযুক্ত করে লিখতেন। কুয় মো-জোর লেখার ধরন সাধারণ চাষী-মজুর-সৈন্যরা না বুঝলেও শহরের বুদ্ধি-জীবীদের উদ্বুদ্ধ করতে তাঁর লেখা বিশেষ সহায়তা করেছে।"

লী পা-চাও বোধকরি ভুলেই গিয়েছিলেন ঘড়িতে রাত এগারোটা বেজে গেছে। বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা তাঁর আগাগোড়া জানা। তাই বলতে গেলেই অনেক ধরনের সমস্যার উল্লেখ না করে পারেন না।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, "এই বরফ ঝড়ে ফিরবে তুমি? রোদের দেশের মেয়ে তুমি, কত কষ্টই না হচ্ছে।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম যে, শীত আমার মোটেই লাগছে না। আমার আর একটা প্রশ্ন ছিল তা না জেনে উঠবো না ঠিক করেছিলাম। আধুনিক চীনে মজুরদের মধ্যে থেকে কিভাবে লেখক তৈরী করা হচ্ছে তার উদাহরণ দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞসে করলে উনি এক মুহূর্তে চোখ বুঁজে ভেবে নিয়ে বললেন:

"১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে কুয়োমিণ্টাং ও মুক্ত এলাকার লেখকদের এক সম্মেলন হয়। দুই এলাকার কাজ যুক্তভাবে চালানোর পরিকল্পনা করা ছিল এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। নিখিল চীন লেখক সংঘের সৃষ্টি হয় এখানে।

"এ সম্মেলনে মাও সে-তুং এর নির্ধারিত পথ মেনে নেওয়া হয় ও নতুন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির প্রস্তাব আসে। এক দারুণ উৎসাহের বান ডেকে যায় এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে।

"অল্পবয়সী সাহিত্যিকরা এ সম্মেলনের পর মজুরদের মধ্যে লেখক সৃষ্টি করা ও নিজেরা আরও ভাল লেখার জন্যে এক আন্দোলন শুরু করলেন। এই

আন্দোলনের ফলে ১৯৪৯ সালে মজুরদের মধ্যে থেকে ১০৫টি লেখা তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে নাটিকা ৪৯ ও কবিতা ৪৪টা। লেখাগুলোর বেশীর ভাগই যৌথভাবে অল্পবয়সী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে মজুর লেখকদের লেখা। এসব লেখার বিষয়বস্তু সচরাচর উৎপাদনের সমস্যা। দালাল চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে লড়াই, মজুরশ্রেণীর একতার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখা। প্রথমে মজুররা একটি গ্রুপ তৈরী করে, যারা একজোটে লেখার একটা কাঠামো বানায়। তারপর এদের মধ্যে যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান, সে এই যৌথচিন্তাকে সাহিত্য-রূপ দেয়।

"বিপ্লবের আগে চীনে একটিও মজুর লেখক ছিল না। এখন মজুর শ্রেণীর ভেতর থেকে প্রতিভা আবিষ্কারের কাজ দিন দিন এগিয়ে চলেছে।

"পিকিং-এ আমাদের লেখক সংঘ, ৩০০ জন বুদ্ধিজীবী ও মজুর নিয়ে এক গ্রুপ তৈরী করেছে যারা নতুন চীনের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন ধরনের লেখার উপায় বাৎলাতে চেষ্টা করছে।

"সংগঠনের দিক থেকে যদিও লেখক, শিল্পী, বাদ্যকর ইত্যাদি আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু তারা সকলেই একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

"আজ চীনের লেখক ও শিল্পী সংঘের আওতায় তিনটি বড় বড় পত্রিকা বার হয়। তিং-লিংএর সম্পাদনায় লেখক ও শিল্পী সংঘ থেকে মিলিত ভাবে একটি বার হয়। দ্বিতীয়টি মাও-তুনের সম্পাদনায় শুধু লেখক সংঘের মারফৎ বার হয়। এ পত্রিকায় প্রধানত সাহিত্য সমস্যা আলোচনা করা হয়। তৃতীয়টির সম্পাদনা করি চাও স্থ-লী ও আমি; এটি অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌পদ পাঠকদের জন্যে। শাদা কথা শাদা ভাষায় লেখা।"

চীনের বুদ্ধিজীবীদের অপর অংশ, অর্থাৎ যারা ঠিক শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে পড়েন না, তাদের সঙ্গে আলাপ হল এক অভিনব পরিবেশে।

পিকিং থেকে মাইল তিরিশ দূরে একসময় এক বিরাট সৈন্য শিবির ছিল। সেখানে থাকত কুয়োমিণ্টাং ফৌজের এক বিরাট বাহিনী। এখন সেই শিবিরটি ঠিক তেমনিই আছে। শুধু তার পুরনো অধিবাসীরা চলে গিয়েছে। চলে

গিয়েছের চেয়ে পালিয়ে গিয়েছে বললে অবশ্য কথাটা ঠিক বলা হয়। তারা শুধু পালায়নি, তাদের পা জোড়া তাদের যত তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পেরেছে তত জোরে তারা ছুটে চলে গিয়েছে তাইওয়ানে, মার্কিণ-প্রভুদের তাঁবে। এখন এই শিবিরে নতুন মানুষ এসেছে। এর একটা নতুন নামও দেওয়া হয়েছে। এর সরকারী নাম হল "বিপ্লবী গণবিশ্বালয়" আর ডাক নাম হল—"চিন্তা-বদ্‌লানো কারখানা"। এখানে এখন আর সৈন্যদের মাতাল হল্লা শোনা যায় না। সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখানে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনো করে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য পুরনো সমাজের ইস্কুলে-পড়া বুদ্ধিজীবীদের নতুন ক'রে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এখানে বিশেষ করে তারাই পড়তে আসে যারা পুরনো ধারায় চিন্তা করার দরুণ নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছে না। এখানকার ছাত্রছাত্রীদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত বা ধনী পরিবারের। এদের মধ্যে অনেকে হয়ত ইস্কুল মাস্টার, কেরাণী বা অধ্যাপক।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর চার-পাঁচ মাসের একটা "কোর্স" ছাত্রদের নিতে হয়। যারা ভালভাবে পাশ করে তারা সরকারী দপ্তরে বা অন্য যে কোন জায়গায় চাকরী পাবার উপযুক্ত বলে নির্ধারিত হয়। মার্কসবাদ সম্বন্ধে মূলগ্রন্থ পড়া ছাড়াও এদের নানা বিষয় শেখান হয়। গণসংগঠন ও তার শক্তি, চীনের মজুর শ্রেণীর ভূমিকা ও দেশের ভাগ্য নির্ণয়ে তার নেতৃত্বের মূল্য, সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার ভিত্তিতে পড়াশুনো করার দাম, যৌথভাবে এবং নিজে নিজে পড়ে জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টার কি ফল ইত্যাদি নানা বিষয় থাকে এদের দৈনন্দিন পাঠ্যতালিকায়।

একটা বিরাট হলঘরে একজন অধ্যাপক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ওপর মাইক্রোফোনের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আর তাঁর সেই বক্তৃতা বড় বড় লাউড-স্পীকারের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন হলে শোনা যাচ্ছিল। সমস্ত ঘরেই ছাত্রছাত্রীরা ঠাসাঠাসি করে বসে নোট নিচ্ছে। অনেককে দেখলাম বাইরের বারান্দায় মাটিতে বসে লিখতে। শুনলাম ঐ বক্তৃতা এখন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী শুনছে। বক্তৃতা হয়ে গেলে পড়ুয়ারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবে। তারপর রাতে যে যার নিজের ঘরে বসে এ-বিষয়ে পড়ে নিজের ব্যক্তিগত

মত গড়ে তুলবে। সকাল হলে আবার ছোট ছোট দলগুলো বসে তুমুল আলোচনা শুরু করে দেবে। যদি নিজেরা কোন সমস্যার সমাধান এ-ভাবে না করতে পারে তাহলে অধ্যাপক এদের নিয়ে বসবেন। সমাধান না হওয়া অবধি কোন সমস্যাকে ছাড়বার নিয়ম নেই।

এমন একটি প্রকাণ্ড হলঘরে একটা স্থায়ী প্রদর্শনী দিবারাত্রি খোলা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবনযাত্রার প্রত্যেকটা দিক এখানে নানাভাবে দেখানো হয়েছে। এক জায়গায় দেখলাম অনেক মজার মজার কার্টুন। এমনি একটা কার্টুন দেখানো হয়েছে—এক বেচারী ছাত্র পুরনো চিন্তার বোঝা নিয়ে নতুন সমাজের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে পোঁটলা চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। একটা দেওয়ালে দেখলাম একটি মেয়ের জীবনী টাঙানো। মেয়েটির জীবনীর শুরুতে দেখলাম তার পরণে বেশ রঙ্‌চঙ্‌ করা "সোসাইটি লেডী"র সাজ। পরে দেখলাম এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাবার সময় সে স্বাভাবিক একটি মেয়ে—স্বাভাবিক সাজসজ্জায়। জিজ্ঞেস করে জানলাম, মেয়েটি আগে অদ্ভুত পরগাছা প্রকৃতির ছিল। এখন নাকি পুরনো চিন্তার মোট কাঁধ থেকে নামাতে পেরে দারুণ কাজের মেয়ে হয়ে উঠেছে। ওর জীবনী এভাবে দেওয়ার উদ্দেশ্য—অন্যদের উৎসাহিত করা।

এক জায়গায় দেখলাম ভারী অদ্ভুত সব "চার্ট" টাঙান রয়েছে। চার্টগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কে কোন্ শ্রেণী থেকে এসেছে, কি উদ্দেশ্যে এসেছে, তাদের চেতনার স্তর কি ইত্যাদি নানা বিষয়ের ছক-কাটা হিসেব দেওয়া আছে। একটা "চার্ট"-এর ওপরে লেখা আছে দেখলাম—"ছাত্রদের সাংস্কৃতিক চেতনার মান" আর একটাতে লেখা "পারিবারিক পরিচয়"। তৃতীয় একটায় লেখা "বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার উদ্দেশ্য" ইত্যাদি।

তৃতীয় "চার্ট"টির তলায় যে হিসেব দেওয়া আছে, তা পড়ে দেখলাম: 'সাংস্কৃতিক মান বাড়ানোর উদ্দেশ্যে'—শতকরা ১৫.৫২% ভাগ। 'পড়াশুনোর জন্যে'—শতকরা ১৮.৯২% ভাগ; 'কাজ পাবার আশায়'—৩২.০২% ভাগ; 'খাওয়ার জন্যে'—৭.৮১% ভাগ; 'উদ্দেশ্যহীন'—১০.৪১% ভাগ পলায়নী মনোবৃত্তি'—

২'৮৪% ভাগ ; 'অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে'—৩'৬১% ভাগ ; 'প্রেমের জন্যে'—১'০৭% 'প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে'—০'৩৭% ভাগ ; 'গুপ্তচর'—০'৭৯% ভাগ, ইত্যাদি।

আমি অবাক হয়ে কমরেড লি পেই-চিকে জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরণের "চার্ট" বানানো কি করে সম্ভব। লি-পেই-চি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্তা। হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "ঐ তো! ঐ হল আমাদের শিক্ষার গুণ। কিছুদিন নিয়মমত পড়াশুনো করার পর ছাত্রদের নিজের মুখ থেকেই তোড়ে আত্মসমালোচনা বেরিয়ে আসে। ওদেরই আত্মসমালোচনার ওপর ভিত্তি করে ঐসব চার্ট বানানো হয়।" বলে উনি আমায় একদিকে টেনে নিয়ে গেলেন। দেখলাম একটা টেবিলের ওপর সারি সারি সাজানো রয়েছে—বন্দুক, রিভলভার, বেতারে খবর পাঠানোর যন্ত্র, ছুরি, ছোরা ইত্যাদি। ওগুলো দেখিয়ে লি পেই-চি বললেন, "ওগুলো সব কুয়োমিণ্টাং-এর গুপ্তচরদের কাছ থেকে নেওয়া। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বাধা দেবার জন্যে ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বেচারী চিয়াং—আমাদের শিক্ষার রীতিনীতি তার জানা নেই। তার নিজের পাঠানো দালাল,—কিছুদিন পড়ার পর সুড় সুড় করে এসব আমাদের দিয়ে দিয়েছে। এক গত বছরেই অতগুলো গোয়েন্দা ধরা দিয়েছে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির হাতে,' বলে খুব খানিক হাসলেন লি পেই-চি। এমন একটা শক্তির সন্ধান মেলে ভদ্রমহিলার আচরণে। শুনলাম ছাত্ররা যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয় করে তাঁ'কে। সমালোচনা—আত্মসমালোচনার সভায় ইনি নাকি এমন কড়া এবং এমনভাবে সব সমস্যাকে নাড়াচাড়া করার শক্তি রাখেন যে কমরেডরা সব সময় তটস্থ থাকে। শিক্ষয়িত্রী হিসেবে বিপ্লবী মহলে এঁর নামডাক খুব।

প্রাচীরপত্রগুলোতে দেখলাম 'মতের লড়াই'। একদল প্রশ্ন তুলেছে একধারে। অন্য একটি দল উত্তর লিখে দিয়েছে। এক জায়গায় দেখলাম প্রেম সম্বন্ধে দারুণ মতবিরোধ। "মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রেম"—এ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা চলছে। দেখলে আমাদের দেশে অনেক অধ্যাপক মূর্চ্ছা যাবেন।

ছাত্রদের ছুটির ঘণ্টা বাজল। ওরা সব দল পাকিয়ে আমাদের ঘিরে ধরে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমি জানালাম—"না, আমরা স্বাধীনতার নামাবলী গায়ে পরেছি বটে, তবে সত্যি স্বাধীন হইনি। তোমাদের চিয়াং ও তো বলত চীন স্বাধীন, তাহলে কি তোমরা সত্যি স্বাধীন ছিলে? এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমাদের মস্তিষ্কে ছাড়া দেশের কোথাও নেই। আর পড়বে কি মানুষ? খাবে তো আগে!" ছাত্রছাত্রীরা আমার কথা খুব পরিস্কার উপলব্ধি করেছিল। এই কদিন আগে ওরাও তো আমাদের মতই দীনহীন ছিল। আর আজ?

একজন ছাত্র বেশ ভাব জমিয়ে নিল।—চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ধনী পরিবার থেকে আসছে। বলল, "উঃ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকে কার সাধ্য! আমি কী চেষ্টাই না করেছিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, শুধু দেখবো, কিছু বলবো না। কিন্তু বুঝেছি কি বুঝিনি, একদিন দেখি হুড় হুড় করে সব ব'লে ফেলেছি। কিন্তু তাতে সত্যি ভারী উপকার পেয়েছি। মন মেজাজ সব হাল্কা হয়ে গেছে। একেবারে নতুন মানুষ করে ছেড়েছে এরা আমাকে।"

ছাত্রছাত্রীদের দিকে দুষ্টুমিভরা চোখে তাকিয়ে লি পেই-চি বললেন, "কেমন ওষুধ—। ওদের জিজ্ঞেস কর না? মার্কসবাদ লেনিনবাদ বড় কড়া জিনিষ। পুরনো গলা-ধ্বসা চিন্তাগুলোকে ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়েছে। ও যেন বিজ্‌লির মত, সুইচ টিপলেই আলো জ্ব'লে ওঠে। এমন কি যে সব লোকদের সারানো প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছে তাদের অবধি এর গুঁতোয় সারিয়ে তোলা গিয়েছে।"

যাবার সময় হল। কমরেড লি পেই-চি অনেক আদর করে খাওয়ালেন। যত খাওয়ালেন তত গল্প শোনালেন আর হাসলেন। হাসালেনও যথেষ্ট। এত ভাল লাগল এই শিক্ষয়িত্রীটিকে।

শেষে বললেন, "উঃ, কত বছর, কত বছর ধরে অপেক্ষা করেছি! বিপ্লব সফল হতে কতগুলো বছর কেটেছে বলোত। ১৯২৩ সালে যখন আমার ১৯ বছর বয়েস তখন আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। প্রতিটি বছর আশায় আশায় কেটেছে। আজ সে আশা সফল হয়েছে। কতবড় কথা বলত?"

ভবঘুরে ওয়া

নতুন চীনে বিরাট আকারে আগাগোড়া সমাজের ভোল বদলাবার পালা চলেছে। চীনের সমাজ-জীবনে আজ এমন কোন জায়গা নেই যেখানে নতুন জীবনের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে না। এমন কি যারা ছন্নছাড়া ভবঘুরে, যারা ছোকরা চোর-ছ্যাঁচড়, তাদেরও স্বভাব বদলে মানুষ করবার ভার নিয়েছে আজ নতুন চীনের গণরাষ্ট্র।

সাংহাইতে চিয়াং কাই-শেকের আওতায় "মার্কিণ সভ্যতার" যা স্বাভাবিক ফল তা ফলেছিল—শহর জুড়ে তারা তৈরী করেছিল ছন্নছাড়া ভবঘুরে আর চোর বদমাইশের দল। সাংহাই মুক্ত হবার ছ'মাসের মধ্যে এদের সুস্থ সমাজ জীবনে ফিরিয়ে আনার কাজ পুরোদমে সুরু হয়ে গেল। সে সময় আমি সাংহাইতে।

এই কাজে যারা হাত দিয়েছিল তাদের একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার কাছে তার অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম। ছেলেটির বয়েস বেশী নয়। সাংহাই-এর যে সব বস্তীতে এই ধরণের সব লোকদের আড্ডা ছিল, ছেলেটি সেখানে তাদের সঙ্গে বসবাস করতে সুরু করে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তার ফাউন্‌টেন পেন, পেন্সিল, টাকাকড়ি, যথাসর্বস্ব তাকে খোয়াতে হল। এমন যে ঘটবে তা সে আগেই জানতো। কাজেই সে একটুও দমেনি। দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে সে লেগে থাকল। তারা যখন চুরি বাটপাড়ি করতে বেরোত, তখন সে সঙ্গে থাকতো। কিন্তু সব সময় সে তাদের খুব দরদ দিয়ে এই কথাই বোঝাত যে তারা যা করছে তাতে কোন ফয়দা নেই। ক্রমে তার ধৈর্যের ফল ফলল। প্রথমে সে তার কলম, তারপর তার পেন্সিল ফিরে পেল। ক্রমেই ছেলেগুলো তার কথার বাধ্য হয়ে উঠল। কেউ কেউ লিখতে পড়তে সুরু করে দিল। কেউ কেউ

শিক্ষানবীশীর কাজে ভর্তি হল, কাউকে কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। "মার্কিণ সভ্যতাকে" এমনি করে সাংহাই থেকে পাৎতাড়ি গোটাতে হল।

শান্‌সী প্রদেশের চাং-তুং গ্রামের ভবঘুরে ওয়াং-এর জীবন কাহিনী ভারি বিচিত্র। ওয়াং ছিল ভবঘুরের একশেষ। তাকে এত সুন্দর দেখতে যে বার বার দেখেও লোকের আশ মিটত না। কিন্তু দেখতে ভাল হলে কি হয়, তার ঘরে হাঁড়ি চড়ত না, আর শয়তানের মত ছিল তার বুকের পাটা। তার ভয়ডরের বালাই ছিল না। না ছিল তার জমি, না ছিল বাঁধা আয়ের কোন কাজ। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। খুব ছেলে বয়েসে বিয়ে হয়েছিল অথচ পরিবারের অন্ন সংস্থান করবার কোন উপায় ছিল না। যদিও তার বয়েস কম, তবুও মরিয়া হয়ে সে বউ বিক্রির ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ল। আগেকার চীনে গরু ভেড়ার মত মেয়েদের বেচে দেওয়া হত। অনেকে বউ কেনা বেচার ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসত। কিন্তু ওয়াং-এর কপাল খারাপ। তার ব্যবসা ভাল চলল না। কেন না গাঁয়ের লোকে ক্রমেই গরীব হয়ে যেতে লাগল, বউ কেনার মত পয়সা তাদের থাকত না।

কোন উপায় না দেখে ওয়াং এবার বরাত ফেরাবার শেষ চেষ্টা দেখল। একদিন খুব সকালে উঠে ওয়াং তার কচি বউ-এর হাত ধরে হাটে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক দরাদরি করে তার বউ-এর বদলে একটা আধমরা ঘোড়া কিনল। পাশেই একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে সব দেখেশুনে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, "খুব ঠকলে দাদা—অমন বউ-এর বদলে অমন ঘোড়া!" বেহায়া ব্যাপারীটা ওয়াং-এর অশ্রুমুখী বউকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে ঝাঁঝ দিয়ে বলল, "মেয়েমানুষের বদলে তুই কেমন ঘোড়া দিস দেখব। মেয়েমানুষের বাজার দর একদম পড়ে গেছে তা কি তোর জানা নেই? আকাল এল বলে—ভুলে যাস্‌নে।" কচি বউটি চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। ওয়াং সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, "কাঁদিসনে বউ। এই ঘোড়া থেকে আমাদের বরাত খুলে যাবে। তখন তোকে আবার আমি খরিদ করে আনব। তোর মুনিবের কাছ থেকে দয়া পাবি।" "দয়া তোর ঠানদি দেখাবে"

কাটখোট্টা ব্যাপারী এই কথা বলে মেয়েটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ছ্যাক্‌রা গাড়ীতে তুলল। রুগ্ন ঘোড়াটার হাড় বার করা পাঁজরায় হাত বুলোতে বুলোতে ওয়াং ধূলিমলিন পথের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর যখন সে চলতে আরম্ভ করল, তখন তার অস্থির হৃদয়ে বার বার একটা জ্বালা খুঁচিয়ে উঠতে লাগল —বার বার সে মনে মনে আওড়াতে লাগল, "না না—মেয়ে ফেয়ে বাজে জিনিষ। ঘোড়াই লক্ষ্মী।"

পরদিন সকালে ওয়াং তার ঘোড়াটাকে নিয়ে বুক টান করে যখন জমিদারের কাছ থেকে ভাগে নেওয়া জমিটুকুতে লাঙল দিতে গেল, পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। একজন চেঁচিয়ে বলল, "ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছে—। ওয়াং ছাড়া কেউ নয়। এ-ই ওয়াং, কোত্থেকে ওটাকে ধরে আন্‌লি?"

ওয়াং হেঁকে বলল, "বউ দিয়ে পেয়েছি।" লোকটা ছি-ছিকার ক'রে ব'লে উঠল, "বদমাইশ কোথাকার! পরের বউ বেচে আশ মেটেনি, এখন এই রদ্দি মালের জন্যে নিজের বউটাকে বেচেছিস্?—আ পোড়াকপাল!"

যা ভাবা গিয়েছিল তাই হল। কিছুদিন যেতে না যেতে ঘোড়াটা অক্কা পেল। ওয়াং তো ছোট ছেলের মত কেঁদে কেটে সারা হল। তার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। এখন সে কি করে বাঁচবে? কেউ তাকে বাঁচার রাস্তা বলে দিতে পারল না। এবার সে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল। ভিক্ষে করে হোক, ধার কর্জ করে হোক, চুরি ডাকাতি করে হোক সে তার পেট চালাতে লাগল। লোকে তাকে ঘেন্না করতে লাগল। ওয়াং হয়ে উঠল সকলের বিভীষিকা। কুয়োমিণ্টাং আর জাপানীদের আমলে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলেরাই ছিল একমাত্র, যাদের জেলের ভয় ছিল না। কেন না জেলখানায় তারা নানা রকমের আস্কারা পেত।

একদিন এই গ্রামে গনমুক্তি ফৌজের হাতে জাপানীদের হার হল। সমস্ত জমিহীন চাষী জমি আর চাষের যন্ত্রপাতি পেল। জমিদারদের বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ল। ওয়াংকেও বলা হল—সে যদি সৎভাবে থাকে, খেটে খেতে রাজী হয়, তাহলে সেও এক টুকরো জমি পাবে। ওয়াং-এর ওসব পছন্দ হল না।

সে উড়োনচণ্ডী হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এদিকে তার গাঁয়ে নতুন জীবনের জোয়ার বইতে লাগল।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে ওয়াং ভাবল গাঁয় কি হচ্ছে যাই দেখে আসি। গাঁয়ে তখন বড় বড় সভা হচ্ছে। গরীব চাষীরা তাকে খুব আদর করে তাদের সভায় নিয়ে গেল। তাদের আগেকার দিনের ভুলভ্রান্তি এবং দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে সভায় আলোচনা হচ্ছিল। ওয়াংকে পেয়ে তার ব্যাপার নিয়েও আলোচনা উঠল। সবাই তাকে খুব কড়া ভাবে সমালোচনা করল। এক বুড়ী বলল, "আর এ-ই হতচ্ছাড়া—ও তার কচি বউ-এর বদলে মরা ঘোড়া কিনেছে। এর চেয়ে জঘন্য কি হতে পারে? পুরনো সমাজের লোকের কাছে মেয়েমানুষের কোন ইজ্জৎ ছিল না। আজ আমরা নতুন জীবন পেয়েছি। আজ এমন দিনে ওয়াং, তোর কি শরম লাগে না?"

ওয়াং-এর সুন্দর মুখটা করুণ দেখাল আর গাল লাল হয়ে উঠল। সে ঢোক গিলতে লাগল। ছল ছল করে উঠল তার দু'টো চোখ। বুড়ী তার চোখের জল দেখে নরম হল। সে জানতে চাইল, "বউটাকে বেহায়ার মত বেচে দিয়ে এখন নিশ্চয় তোর কষ্ট হচ্ছে।"

ওয়াং তার জবাবে বলল, "না মাসী, না—আমি বউ-এর জন্যে কাঁদছি না। মরা ঘোড়াটার জন্যে আমি কাঁদছি। আমার পয়সা করা হল না।"

গাঁয়ের লোক তো হতভম্ব। লোকটা বলে কি! কেউ কেউ তাকে গালাগালি দিতে লাগল। কেউ কেউ এই ভেবে দুঃখ পেল যে, এখনও লোকটা নতুন জীবনের স্বাদ বোঝেনি। কিন্তু নেতারা মনে করলেন যে, ওয়াং মিটিং-এ যে এসেছে এই ঢের। এবার আস্তে আস্তে ওর উন্নতি হবে। তাঁরা ধৈর্য করে ওয়াংকে বোঝাতে লাগলেন, বিপ্লব বলতে কি বোঝায়, পুরনো সমাজের পচা-গলা মনোভাব কেমন করে ছাড়তে হবে। বার বার তাঁরা বলতে লাগলেন,—"তুমি ভেবে দ্যাখ। তুমি গরীব মানুষের ছেলে। তোমার আমার মত লোকের জন্যেই তো এই বিপ্লব।

ওয়াং ভাবতে চেষ্টা করল। চারদিকের হঠাৎ এই সব পরিবর্তন তার কাছে নতুন বলে মনে হচ্ছিল। ভালও লাগছিল। কিন্তু ধাঁধাঁ-লাগা মন নিয়ে সে কিছু

বুঝে উঠতে পারছিল না, সে বার বার ভাবতে লাগল, বউ আবার কি করে সুখ সমৃদ্ধির কারণ হতে পারে? চিরদিনই তো সে কাঁধের বোঝা। আজ কি করে তা বদলাবে?

ওয়াং যত ভাবছে ততই তার ধাঁধাঁ লাগছে। একদিন এক মাঠে একদল গাঁয়ের মেয়ের সঙ্গে দেখা। তারা নিজেদের জমিতে কাজ করছিল। ওয়াং অবাক হয়ে গেল। ওমা, ওরা আবার স্বাধীন হবার গান গাইছে! আজকাল ওরা গান গায়, লেখাপড়া শেখে, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়। কান খাড়া করে ওয়াং তাদের গান শোনে: "কত যুগ, কত বছর ধরে আমরা দিন গুণেছি আমাদের কে বাঁচাবে? তারপর কমিউনিস্ট পার্টি আর মাও-সে তুং আমাদের হাত ধরে উজ্জ্বল ভবিষ্যতে পৌঁছে দিলেন।"

তারপর মাঠের কাছে গিয়ে উবু হয়ে ব'সে ওয়াং মেয়েদের চাষের কাজ দেখতে লাগল। সে ভাবল, "ঘোড়া থেকে ধন দৌলত হবার ধারণাটা মারাত্মক রকমের ভুল।" মনের মধ্যে তখন তোলপাড় চলছে। ব্যথায় তার হৃদয় টন্‌টনিয়ে উঠছে।

বিকেলের সূর্য অস্ত গেলে পর মেয়েরা কাজ সেরে ঘরে ফিরবার সময় ওয়াংকে দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কারণ ওয়াং-এর দুচোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাঁদছ কেন ওয়াং?"

ওয়াং জবাব দিল "বউ-এর জন্যে।" এতদিনে সে স্বাধীন হওয়ার কথাটা বুঝতে পেরেছে। বাউণ্ডুলে ওয়াং এবার সত্যিকারের মানুষ হল।

আনো, শান্তি আনো

দশ হাজার ফুট ওপর থেকে পৃথিবীকে দেখছি। মাইলের পর মাইল যৌথ খামারের চষা ক্ষেত, পাইন বন, পাগল-করা নীল হ্রদ, নরম সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ো—সব পেছনে ফেলে চলেছি। সঙ্গে নিয়ে চলেছি বুক ভরা একখানা ছবি।

মস্কো থেকে চীন। ক'দিনেরই বা পথ! পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি বিস্তৃত দুটো মহাদেশ। তাতে কত বিচিত্র মানুষ, কত নতুন চিন্তা, কত গভীর ভালবাসা, ব্যথা, আনন্দ। মস্কো থেকে চীন। কথাটা ছোট। তিনটে মাস। সময়টা অল্প। অনেকের কাছে মনে হবে জীবনে তিনমাসে দুটো দেশ দেখা, এ আর এমন কি! আমি বলব এ তিনটে মাস আমার কাছে একটা গোটা জীবন।

এ তিনটে মাস আমার কাছে একটা গোটা জীবন। কারণ, এ তিন মাসে আগুনের তাণ্ডবের মধ্যে আমি কত দিগ্‌দিগন্ত জোড়া সবুজকে দেখেছি, কত মাকে জীবনে প্রথম গভীর শান্তিতে বাচ্ছার মুখে চুমো খেতে দেখেছি আর দেখেছি বলিষ্ঠ হাতে আগুন নেভানোর লড়াই। আগুনের হুঙ্কার মধ্যে দেখেছি চোখ জোড়ান শান্তি। দেখেছি বুক জোড়া ভালবাসার প্রকাশ। দেখেছি আমার মা, আমার আর আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ। স্বপ্নে ভারতবর্ষের আগুন লাগানো ক্ষেতে দুরন্ত সবুজের বন্যা।

তুমুল ঝড় উঠেছে। আমরা মেঘের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জলের ঝাপ্‌টা লাগছে জানলায়, উড়োজাহাজের পাখায়। গভীর আর সজল হয়ে উঠেছে আকাশের চোখ। আমি ভাবছি ফেরার পথের এ আকাশকে চিরদিন মনে রাখবো।

চোখ বুজে ভাবছি। আমার চোখে ক্রেমলীনের ছ'টা চুণীর তারা—লাল আলো

ফেলে ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে। হাতে ফুল গুঁজে দিচ্ছে নানকিং-এর চোদ্দ বছরের চীনা মজুর ছেলে। আর শুনছি আধো স্বরে পুতুলের মত বাচ্ছারা গাইছে—"ভিন্‌দেশী মা আমার, কত লম্বা ট্রেনে করে এসেছ আমার দেশে, আমায় দেখতে—।"

ঝড় কমে এসেছে। সমস্ত তুনিয়া জুড়ে একটা স্বর উঠেছে। লক্ষ, কোটি গলায় কারা গাইছে। আর সেই স্বর ওপর দিকে উঠে আসছে।

দেখছি লেনিনের প্রকাণ্ড আকাশ ছোঁয়া এক মূর্তি পূব দিকে ডান হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করছে। মূর্তির নীচে অগণিত মানুষ গাইছে। তাদের গলার স্বর ওপর দিকে উঠছে।

কানে আসছে—

"সূর্যের দেশ ভারতবর্ষ, শান্তি আনো, শান্তি আনো,
শান্তি আনো তুনিয়ায়।"
